সপ্তক

শ্রীইলা দেবী
শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

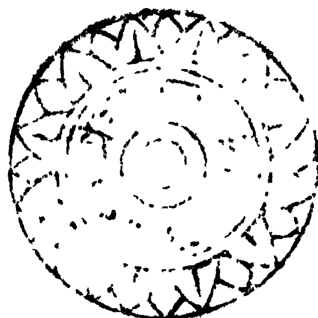
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
১৩৩৫

দেড় টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলা দেবী লিখিত 'প্রত্যাবর্ত্তন', 'দ্বিধা' ও 'লিপি-পঞ্চক' বিচিত্রায় ও 'ভবিতব্যতা' প্রবাসীতে এবং সুধাংশুকুমার হালদার লিখিত—'মানুষের জয়' ও 'ননীলাল' যথাক্রমে বিচিত্রা ও ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। ইলা দেবী লিখিত 'মুক্তি' গল্পটী অপ্রকাশিতপূর্ব।

সপ্তক



সপ্তক

মানুষের জয়

গ্রামে গ্রামে সেট্‌ল্‌মেণ্ট আস্‌ছে। আমরা কানুনগোর দল তাই চলেছি নিজেদের তল্পীতল্পা বেঁধে মন্থর গোযানে। রেল ত এ দেশে নেই, পাকা রাস্তাও নেই। ছোট্ট মার্টিন্ কোম্পানীর রেল ওপারে খানিক দূর এসে থেমে গেছে, তাব পরেই রয়েছে বিরাট দামোদর নদ তার বালির জটা মেলে। কোন নিয়মকে এ গ্রাহ্য করে না, আইন ভাঙাতেই এর আনন্দ। কিছুমাত্র নোটিশ না দিয়ে এ একদিন সহসা উগ্রমূর্ত্তি ধরে। বানের তোড়ে বাঁধ ভাসিয়ে অতর্কিতে গ্রামে গ্রামে তেড়ে আসে; মাঠে মাঠে প্লাবন জাগিয়ে এর ঘোর লাল জল নাচে, 'তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ'। কত শতাব্দী ধরে কত রাজশক্তি একে বশ করবার চেষ্টা করে এসেছে, কিন্তু এ দুর্য্যোধনের মত পণ করেছে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও ছেড়ে দেবে না। মানসিংহ

উড়িষ্যা জয় করেছিলেন, কিন্তু একে জয় করতে পারেন নি। এর পশ্চিম তট হতে যে রাস্তা বরাবর কাশী পর্য্যন্ত চলে গেছে তাকে এর কবল হতে বাঁচাবার জন্যে ইংরেজ কোম্পানীর সে কী আগ্রহ, কিন্তু হঠতে হয়েছে এর কাছে। শেষে মানুষের সমস্ত এঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি নিরুপায় হয়ে এর পুবপারের ঘাটে এসে থেমে গেছে, একে নমস্কার করে বলেছে, তোমার কাছে পরাভব মানলুম। কাজেই দামোদরের পশ্চিম পারে যে দেশ সে হল পরাজিত বিধ্বস্ত মানব সভ্যতার দেশ। সে তার অজস্র খাল বিল, অসংখ্য নদী নালা বালিয়াড়ি নিয়ে মানুষের দিকে দাঁত খিঁচিয়ে চেয়ে আছে। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অতি আদিম কাল হতে মানুষের যে সংগ্রাম সুরু হয়েছিল তার ফলে প্রকৃতিকে অনেক জায়গায় পরাভব মানতে হয়েছে; মানুষ বন কেটে সহর বসিয়েছে, পাহাড় ফুঁড়ে পথ বার করেছে, নদীর কোমরে সেতুর নীবীবন্ধ বেঁধে তাকে সভ্য করেছে। কিন্তু মানুষ যেখানে হেরেছে প্রকৃতি সেখানে অতি উগ্রমূর্ত্তিতে রুখে দাঁড়িয়েছে প্রতিহিংসা নেবার জন্যে। এই দেশ সেই প্রকৃতির প্রতিহিংসা নেবার দেশ। মানুষ চাষ ক'রে ফসল ফলায়, এর নদী এসে তাকে ডুবিয়ে পচিয়ে মারে। মানুষ বন কেটে আবাদ করে, বন্যা এসে বালির চাপ দিয়ে সে আবাদের গলা টিপে দেয়। বন্যাকে আটকাবার জন্যে মানুষ বাঁধ তোলে, তারই আড়ালে ক্ষেতে ফসল ফলায়;—সম্পন্ন হয়, সচ্ছল হয়, সন্তান সন্ততি বাড়ায়। প্রকৃতি পরিশোধ নেয়,—ঐ বদ্ধজলে মশার ডিম ফুটিয়ে।

বানের স্রোত যদি বা কমল', ত ব্যাধির স্রোত এসে গ্রাম দিল ভাসিয়ে। তারই ফলে গ্রাম যখন জনবিরল হল, দুর্বল হল, তখন আবার একদিন উগ্রমূর্ত্তি ধরে ওধার হতে রূপনারায়ণ এধার হতে দামোদর এসে ঐ বাঁধকে দিল ভেঙে। এমনি করে প্রকৃতির প্রতিহিংসা এই হতভাগা দেশের ওপর দিয়ে চলেছে, কতদিনে শেষ হবে কে জানে। মানুষেব শরীরের জোর কমে এলেও সে বেঁচে থাকতে পাবে যদি বুকের জোর না কমে। কিন্তু এই হতভাগা দেশে বর্ত্তমান ত নেই-ই, ভবিষ্যৎ ও অন্ধকার। এখানে মানুষের অবস্থা যেমন ভয়াবহ, এমন আর বোধ হয় কোথাও নেই। কিন্তু এরা নিজেবা ত তা ভাবে না। আমি ত দেখেছি মস্ত মস্ত এদের উদর সতত বর্দ্ধমান প্লীহা যকৃতে ভরপুব, চোখ হলুদ হয়ে এসেছে, কাঠি কাঠি হাত পা, খোনা খোনা কথা। মনে হয় এদের মধ্যদেশ এখনি বেলুনের মত ফুলে উঠে হাত পা গুলোকে নিয়ে আকাশে উড়ে যাবে, হাত পা গুলো প্যারাসুটের মত ঝুলতে থাকবে। কিন্তু তা সত্বেও এরা মামলা করে, নেশা খায়, বিয়ে করে, সন্তান হয়। আমার মনে হয় ভগবান অনুকম্পা করে এদের মনকে মগ্নচেতন করে রেখেছেন। অতি নিদারুণ যন্ত্রণা হলে মানুষ অসাড় হয়ে যায়। ছুরিতে হাত কাটলে বাজে, কিন্তু বন্দুকের গুলিতে হাত উড়ে গেলে বাজেনা। এদেরও সেই দশা।

গোযান চলেছে। সমুদ্রের মত ঢেউ খেলানো রাস্তা। পরিসর পাঁচ হাতের বেশী নয়, গভীরতা বোধ করি তার চেয়েও

বেশী। দু'পাশে ধান হয়েছে, কোথাও বা বেনাবন। তলতলে দইএর মতন কাদা, তার মধ্যে গাড়ীর চাকা দুটো ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। ধরিত্রীর বুকের ওপর চাকা দুটো যেন কোনও এক বন্য জন্তুর মত ধারালো নখ দিয়ে আঁচড় কেটে দিচ্ছে, কি লিখছে ঐ আঁচড়ে কে জানে—বোধ হয় লিখছে—"আমি গোযান, আমি আছি, সেইটে বোঝো। শুধু কি আছি?—বহুকাল ছিলাম আবার বহুকাল থাকব। রামচন্দ্র যখন তীর ধনুক নিয়ে পঞ্চবটীর অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে বেড়াতেন তখনও ছিলাম, এখনও আছি। ট্রেণ হ'ল, মোটর হ'ল, এরোপ্লেন হ'ল, কিন্তু তবু আমি তাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ—আমি বেঁচে আছি; আবার হয়ত ট্রেণ যাবে, এরোপ্লেন ধ্বংস হবে, মোটর রচনা মানুষ ভুলে যাবে,—তখনও আমি থাকব।"—এই জরাজীর্ণ অস্তিত্বের উল্লাসে গোযানখানির সে কী ঘন ঘন কম্পন,—তার রেড়ীর তেল ও আলকাতরা সিক্ত ধুরো দুটি কী 'ক্যাঁকোর ক্যাঁকোর' কলরব!

সন্ধ্যা নামে আর কি। গাঁয়ের লোক হাট থেকে ফিরছে। তাদের গাঁয়ের নাম জিজ্ঞেস করলে সহজে জবাব দেবে না। বলে, "মশায়ের নাম কি, বাড়ী কোথা, কোথায় যাবেন, কেন যাবেন, কবে ফিরবেন।' অর্থাৎ আগে তাদের পঞ্চাশ কথার জবাব দাও, তবে তারা তোমার এক কথার জবাব দেবে। অজানা কোনও লোক গেলে তাদের স্বভাব ভিড় ক'রে দাঁড়ানো। 'কিউরিঅসিটি' জিনিষটা তাদের খুব বেশী। অনেক আগন্তুক এতে চ'টে যায়, ঘৃণা দেবার প্রলোভনও ছাড়তে পারেনা।

মারের ভয় দেখালে এরা 'বাবারে—মারে' বলে ছুটে পালায়, কিন্তু তাতে আশ্চর্য্য হয় না। মার খেতেই ত এদের জন্ম। জন্মাবার আগেই এরা খেয়েছে এদের বাপ মায়ের মার, যার ফলে এদের জন্ম। তারপর এদের মেরেছে পাঠশালার পণ্ডিত, কাছারির গোমস্তা, আদালতের আইন। শাস্ত্রকাররা বিধান দিয়ে দিয়ে এদের মেরে রেখে গেছে বহুশতাব্দী আগে। সমাজ এদের মারছে কুকুরের মত। উকীল মোক্তার এদের ধনে প্রাণে মারছে। তার ওপর প্রকৃতি এদের মারছে পিছামোড়া করে বেঁধে, চোখে ঠুলি পরিয়ে,—বন্যা দিয়ে মারছে, ব্যাধি দিয়ে মারছে। ভগবানের চোখের জল এদের জন্যে ঝরে কিনা জানি না, হয়ত ঝরে, কিন্তু এমন হতভাগা এরা যে স্বয়ং ভগবান ও এদের কিছু করতে পারেন না।

'কিউরিঅসিটি' জিনিষটা এদের প্রবল, তার কারণ শিক্ষা ত এদের চোখের সামনের ছানি কাটিয়ে দেয় নি; এরা আভাসে জানে যে এদের গাঁয়ের, এদের পঞ্চায়েতের বাইরে একটা মস্ত জগৎ আছে যেখানে একটা গাভীর তিনটে বাচ্ছা হওয়া থেকে সুরু করে মস্ত মস্ত আজগুবি ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে যার বিবরণ সপ্তাহে একবার ক'রে বাঙলা খবরের কাগজ থেকে গাঁয়ের চক্রবর্ত্তী মশায় এদের পড়ে শোনান। তাই বাইরের লোক এলে এরা দৌড়ে যায়—জগতের আজগুবি খবর শোনবার জন্যে।

আঁধার নেমে এলো। গাড়োয়ানেরা গাঁয়ের শেষে ঝুরি নামা বৃদ্ধ বটের তলে গাড়ী থামালো, গরু খুললো, জাব দিলো,

আমাদের বললো রান্না খাওয়া ক'রে ঠাণ্ডা হতে। বটতলায় গাড়োয়ানের মেলা। এ অঞ্চলের এই বটতলাই হ'ল মোগলসরাই জংশন, কেলনারের রেষ্টুরেঁা, খোলা হাওয়ার ওয়েটিংরুম। মাটিতে গর্ত্ত কেটে উনান করে সবাই রান্না চড়িয়েছে,—মোটা লাল চালের ভাত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে, তাতে ছেড়ে দিয়েছে একটা কাপড়ে বাঁধা কিছু মসুর ডাল, গোটা দুয়েক আলু আর পিঁয়াজ। জ্বলন্ত কাঠের আর ফুটন্ত ভাতের সুগন্ধে বাতাস ভরে আছে।

তার পর দিন সন্ধ্যায় আমরা এলাম যেখানে সার্কল্‌ ক্যাম্প হয়েছে;—এখানে পড়বে সার্কল্‌ অফিসারের তাঁবু, আমরা কানুনগোর দল কাল প্রাতে যে যার নির্দ্দিষ্ট এলাকায় ছ'সাত মাইল দূরে চলে যাবো। গাড়োয়ানরা কোলাহল করে কাগজপত্তর নামাচ্ছে, ক্যাম্পের পেস্কার সমস্ত দেখছে শুনছে। পাশেই একটা চালা তোলা হয়েছে—তার মধ্যে একধারে পেস্কারের রসুই হবে আর একধারে আস্তাবল। আমাদের জীর্ণ দুর্ব্বল ঘোড়াগুলোকে তার মধ্যেই ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছে, বর্ষা এখনও শেষ হয়নি, বলা যায় না, এখনই আবার জল আসতে পারে। অসহ্য গুমোট গরম, আমরা বারান্দায় ভাঙা মেজের ওপর কম্বল বিছিয়ে বসে আছি। কাল থেকে আপন আপন ক্যাম্পে গিয়ে আমাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম সুরু হবে, তার আগে এই মোট একটি সন্ধ্যা। 'কানন-গো'—আমাদের এ নাম কে দিয়েছিল জানি না। কিন্তু নাম যেই দিক, তার নাম করণের

বেশ একটা ক্ষমতা ছিল বোঝা যাচ্ছে। কাননে যেতে হয় তাই কানন গো। অর্থাৎ বনবাসই হ'ল আমাদের চাকরী। কোনও এক যক্ষকে তার মনিব এক বছরের জন্য বনবাসে পাঠিয়েছিলেন, তারই দুঃখে কালিদাস লিখে ফেল্লেন অতবড় একটা মহাকাব্য। আর আমাদের এই যে নিরন্তর বনবাস এতে কই কোনও কবির সুনিদ্রার যে ব্যাঘাত ঘটেছে তাত জানা নেই। আসল কথা হ'ল দুনিয়াটাই খোসামুদে। কিন্তু দুঃখ এই, হায় বাগ্দেবি, তুমিও এই কলঙ্কের ভাগী হলে? হ'তাম যদি রাজার ছেলে তাহ'লে আজ এই বনবাসের সূত্রপাতে আসন্ন বিরহের ম্লানচ্ছায়া এই সন্ধ্যার ওপর কত কবিই না কত মহাকাব্য লিখে ফেলতেন। ইংলণ্ডের প্রিমিয়ার প্লাস্‌ফোর্স পরে গল্‌ফষ্টিক্ তুলে দাঁড়িয়ে আছেন, তার ছবি আদর ক'রে কাগজে কাগজে ছাপাচ্ছে; প্রেসিডেণ্ট হুভার ট্রেনের মধ্যে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে মাথা বার ক'রে টুপি তুলে বিদায় জানাচ্ছেন, তার ছবি দৈনিকে, মাসিকে আর ধরে না।—কিন্তু এই যে আমি শ্রীনটবর পাল গোযান-যাত্রার কালে তিনদিনের পরিপুষ্ট খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ নিয়ে—আমার জীর্ণ কম্বলে বসে আজকের এই একটি অন্তিম সন্ধ্যার কথা ভাবছি, এর ছবি তুলতে কই কারো ত মাথাব্যথা দেখছি না। যদি লিখিয়ে হতাম তাহলে বীণাপাণির এই আভিজাত্য গৌরব চূর্ণ বিচূর্ণ করে সেখানে খাঁটি বল্‌শেভিজ্‌মের ঝড় বহিয়ে দিয়ে যেতাম,—কিন্তু হায়, এমনি দেবীর এক চোখোমি, লিখতে বসলে কলম থেকে হ্যাণ্ড নোট্ ছাড়া আর কিছুই বেরোয় না।

এই সব ভাব্‌ছি, এমন সময় আমাদেরই নবীন আট নম্বর হুক্কার কানুন-গো—হুঁকাতে দু'টা টান দিয়ে বল্‌লে, "নাঃ, তামাকটা ভাল লাগছে না, বোধ হয় জ্বর এল।"

ম্যালেরিয়ার এই একটি গুণ যে সে কলেরা বা প্লেগের মতন ঝাঁ ক'রে আসে না, তার আগমন ধ্বনি আগে হতেই অনুভব করা যায়। তামাকটা বিস্বাদ লাগা হল ঐ একটি আগমন-ধ্বনি। আরও আছে। গ্রামের শেয়ালগুলো সব বিকট ডেকে উঠল। কাছেই এক শ্মশান থেকে 'হরিবোল, হরিবোল্' শোনা গেল। আমরা হিন্দু মায়াবাদী, বিশ্বাস করি সকলই মায়া। তাই কেউ যখন মরে তাকে নিয়ে দস্তুর মতন হৈ হৈ করি, চুপি চুপি সারি নে। কারণ মরাটা হ'ল মায়াবাদের একটা অকাট্য প্রমাণ,—জীবন অনিত্য। তাই আমরা যখন মড়া পোড়াতে যাই, তার আগে বেশ করে একছিলিম গাঁজা খেয়ে নিই, সারা পথ চেঁচাতে চেঁচাতে যাই, যেন যাবতীয় জীবিত লোকের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করছি। হাটতলায় গেলে দু'শোবার চেঁচাই—"বল হরি হরিবোল।"—নিশুতি রাত হলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শ্মশান যাত্রার পথের দু'পাশের লোক-জনের ঘুম বেশ সুনিশ্চিত ভাবে ভাঙে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চেঁচিয়ে যাই—"হরিবোল, হরিবোল।"

আমাদের নবীন বল্‌লে—'দেখ আমার গান পাচ্ছে',—এই বলে সে একটা গান গেয়ে উঠলো। ম্যালেরিয়ার আর এক অভ্রান্ত আগমনধ্বনি হ'ল এই গান পাওয়া। বড় বড় বক্তারা

সভায় যেমন বক্তৃতার একটা urge পান, ম্যালেরিয়া রোগীও তেমনি গান ও বক্তৃতার একটা urge পায়। এই যে অকাল স্থায়ী urge—এর ওষুধ হচ্ছে ফিভার মিক্শ্চার,—কিন্তু এই যে বাগ্মীদের স্থায়ী urgeএর কথা বললুম ওর ওষুধ নেই। ওর একটা ওষুধ থাক্‌লে আমাদের লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট হতে আর কোনও ভদ্রসন্তানের আপত্তি থাকত না।

পুরা দমে সেট্‌ল্‌মেণ্টের কাজ চল্‌ছে। মাঠ ঘাট নদী নালা খাল বিলের নক্‌সা তৈরী হয়ে গেছে। নক্‌সা করছে আমিনরা, আর আমরা করছি তদারক্। দুনিয়ার যত রকম কষ্ট সহিষ্ণু জীব আছে, আমিন হল তাদের সেরা। নীচে জল, ওপরে রোদ, এই অবস্থায় তারা মাপছে চেন লাইন, হাঁকছে দু'নল দশ, আর ছুঁচালো পেন্সিল দিয়ে লাইন টেনে টেনে জমির নক্‌সা তৈরী করে যাচ্ছে। কখনও পায়ের তলায় কেউটে সাপ ফোঁস্ করে উঠছে, কখনও মাথার ওপর হাকিম এসে ফোঁস্ করছেন, আর গাল দিচ্ছেন ন ভূত ন ভবিষ্যতি। জ্বর ত লেগেই আছে, তবু এরা দমে না। আলেক্‌জাণ্ডার বেরিয়েছিলেন দিগ্বিজয়ে, কিন্তু পঞ্চনদে এসেই থেমে গেলেন। আমার মনে হয় তাঁর যদি একদল সেট্‌লমেণ্টের আমিন কানুনগো সহায় থাকত তাহলে তিনি ভারত কেন সমগ্র পৃথিবী জয় করে ফেল্‌তে পারতেন।

খানাপুরি আরম্ভ হয়ে গেল। ধানকাটা শেষ হয়েছে, মাঠের জল শুখিয়ে এসেছে। বড় বড় বিলের মধ্যে এখন বেশ হেঁটে যাওয়া যায়। অসুখবিসুখ কমে এসেছে। গ্রামে গ্রামে আবার

হাসি ফুটে উঠেছে। আমি রোজ ভোরে বার হই, ছোট্ট আমার বেতো ঘোড়ায় চড়ে। বেতো বললাম কারণ ঐ জাতীয় ঘোড়ার আর দ্বিতীয় নাম নেই। কিন্তু কার্য্যক্ষম কম না। ঠিক যেন বাঙালী কেরাণী,—সমস্ত দিন মুখ বুজে খাটে। অনেকদিন আছে কিনা, আর এই কাজই করছে, মাঠের মাঝখানে কোথায় আমিন আছে তা এ পশু সুলভ বুদ্ধিতে টের পায়, তার পর দৌড় দেয় আমিনের টেবিলের দিকে। জানে, ঐ হ'ল ওর নঙর ফেলবার বন্দর। সেখানে ও ছাড়া পায়, মাঠের ঘাস আর ডোবার জল প্রাণ ভরে খায়, কাছে কাছেই চরে, মারলেও নড়ে না। আমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি মোজার গোড়ালিটা ছিঁড়ে গেছে, নিকষকৃষ্ণ পায়ের রঙ জুতার পিছন থেকে উঁকি মারছে, খাকীর আধাপাৎলুনের ডাইনে বাঁয়ে হাজারবার হাত মোছার ছাপ, সবুজ কালি সছিদ্র ফাউণ্টেন পেন থেকে পড়ে তারই অনেক জায়গা দেগে দিয়েছে। মোজা জামাটায় তালি দেওয়া দরকার, কোটের বোতাম দু'টো ছিঁড়ে গেছে—কিন্তু সারে কে? এ সব ত আর পুরুষ মানুষের কাজ নয়। মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। তবু ভাবি, হিন্দু বলে আমরা কী রক্ষেই না পেয়ে গেছি। নইলে এই নির্ব্বাসনের চাকরীতে পতিব্রতারা ডেজার্‌সানের অপরাধে কোন্ কালে তালাক দিয়ে দিতেন। স্ত্রীর হাতে পরিয়ে দিয়েছি এক মক্কম লোহা,—ও থেকে তার আর নিষ্কৃতি নেই। আগে বোধ করি বিবাহিতাদের হাতে হাতকড়া পরাণার রীতি ছিল। নাক ফুঁড়ে

দিতাম নথ, কান ফুঁড়ে মাকড়ি—দুই হাতে হাতকড়ি, দুই পায়ে মলের বেড়ী। কিন্তু মেয়েদের কয়েদ করলেও আমাদের যে শিভাল্‌রি নেই একথা বলে কে? খাঁটি সংস্কৃত শ্লোকে মেয়েদের সম্মানও ত দিয়েছি বিস্তর, যদিও কয়েদ করেছি কোসে। পাখীকে খাঁচায় পুরে তার ওপর কবিতা লিখেছি। জেলখানায় থেকে থেকে তারা জেলকেই ভেবেছে গৃহ, বাহিরকে ভেবেছে বিষবৎ পরিত্যজ্য। আনন্দের কথা হচ্ছে এই যে, এখন তাদের মুক্তির প্রধান অন্তরায় হচ্ছে তারাই, তাদের পীড়নের প্রধান অস্ত্রই হচ্ছে তারাই,—পুরুষরা নয়। পরাধীন জাতিরা নিজের থেকেই যদি স্বাধীনতা না চায়, যদি নিজেদের ভেতরেই মারামারি ক'রে মরে,—সেইটাই হল সাম্রাজ্যবাদিদের চরম গৌরব। ডিপ্লোম্যাসিতে হিন্দু শাস্ত্রকাররাও বড় কম ছিলেন না।

বাড়ী থেকে খবর এসেছে সেজ ছেলেটার জ্বর, ছোটটার রিকেট্‌স হয়েছে। মেজ মেয়েটার বিয়ের চেষ্টা বিশেষ করেই করা দরকার, বড় ছেলেদের টিউসানি গেছে এখন বেকার বসে খাচ্ছে, আমাদের কানুনগোদের ওপর ষষ্ঠীর কৃপা খুবই—।

খবর ছিল সাহেব আসবেন ইন্‌স্‌পেক্‌সানে। যতদূর সম্ভব সব ঠিক্‌ঠাক্ করে ফেলেছি। এই কাজে চুল পাকালুম ভুলচুক ঢাকবার মারপ্যাঁচ কি আর জানা নেই ভেবেছেন? সাহেবের আসবার পথে পথে যেখানেই কাজের একটু গোঁজামিল ছিল সেখান থেকে আমিনদের সরিয়ে দিয়েছি অনেক দূরে,—আর তাদের জায়গায় বেছে বেছে ভাল ভাল আমিন বসিয়েছি।

নক্‌সার ওপর যেখানে যেখানে তেলকালির দাগ পড়েছিল সেখানে কোসে পাঁউরুটি ঘসিয়ে মেজে সাদা করে রেখেছি। নক্‌সাগুলো ধোপদস্ত ডিনার সার্টের মতন চক্‌চক্ করছে।

সাহেব এলেন, পরীক্ষা করলেন, ফল ভালই হ'ল। হবারই কথা। এখন আর কিছু গণ্ডগোল না হলেই বাঁচি। উৎপাত কোথা থেকে কখন এসে পড়ে তাকি বলা যায়? মর্ম্মাহত হ'লাম সাহেবের কথা শুনে,—"হ্যালো কানুনগো, তোমার সব ক'টি ভাল আমিনইত আমার পথের ধারে বসিয়ে রেখেছ, কিন্তু খারাপ আমিনগুলি কোথায়? আমি নবী বক্সকে দেখতে চাই।" ফ্যাসাদে পড়লাম। নবী মিঞা আমিনের বয়েস হয়েছে, কাজে বেজায় ভুল করে। তবে আমার ফাইফর্ম্মাসটা খাটে, আগে গিয়ে বাসাটাসা ঠিক করে রাখে, তাকে একটু স্নেহ করি। কেবলই ভাবি তাকে ছাড়িয়ে দেব, কিন্তু উপকার পাই বলে ছাড়াতে মন ওঠে না। তাকে দিয়েছিলাম অনেক দূরে সরিয়ে, কিন্তু সাহেব তাকে না দেখে ছাড়লেন না।

নবী আভূমিপ্রণত সেলাম করে বললে—'আদাব'। কিন্তু কাজে বেরোল বেজায় ভুল। সাহেব বল্লেন—'তুমি এই নক্সা তৈরী করেছ?'

নবী মাথা চুলকে বল্‌লো—'ছার।'

সাহেব বল্লেন,—'কই' পয়েণ্ট বসাও দেখি আমার সাম্‌নে,—লাইন তিনশো পঞ্চাশ, অফ্‌সেট পঞ্চাশ।'

নবী ডিভাইডার বাগিয়ে ধরলো, কিন্তু ঠক্ ঠক্ করে তার

হাত কাঁপতে লাগল। সাহেব এটা লক্ষ্য করলেন, বললেন, 'তোমার হাত কাঁপে কেন ?'

নবী মাথা চুলকে শুধু বল্‌লো—'ছার'।

সাহেব বল্লেন—'তুমি হোপ্‌লেস্‌লি বুড়ো হয়ে গেছ, তাই তোমার হাত কাঁপে।'

নবী চুপি চুপি আমাকে বল্‌লো যে সাহেবকে দেখে তার ভয় হয়েছে, তাই তার হাত কাঁপছে। আমি এ কথা জানালুম। তিনি বল্‌লেন, "কুছপরোয়া নেই। আমি এই টেবিলের তলায় লুকোচ্ছি। তুমি এইবার পয়েণ্ট বসাও।" এই বলে টেবিলের তলায় ঢুকে চুপ করে বসে রইলেন। নবী পয়েণ্ট বসাল, সাহেব তাঁর নিজের যন্ত্র পাতি বার করে পরীক্ষা করে দেখলেন, বললেন, 'পয়েণ্ট ভুল।' এই বলে নবীর ম্যাপ দিলেন রবার দিয়ে মুছে, আর আমাকে বলে দিলেন ওর হাতের কাজ শেষ হলেই যেন ওকে বিদায় করে দেওয়া হয়।

কিন্তু নবী দমিবার পাত্র নয়, সে সাহেবের যন্ত্রের সঙ্গে নিজের যন্ত্র মেলাচ্ছিল, এখন কাঁদতে কাঁদতে বললো,—"এই দেখুন ছার। আমার এই আইভারি স্কেল খারাপ, সার্কেল ক্যাম্প থেকে স্কেল দিয়েছে, তাতেই আমার কাজ ভুল হয়েছে, আমি কি করব ছার!"—এই বলে আবার হাপুস নয়নে কান্না।

সাহেব নবীর হাত থেকে তার স্কেলটা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার পর দস্তুর মত দমে গিয়ে আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন—"তাইতো তাইতো, নবীর কথাইত ঠিক।" আমারও

নবীর ওপর দয়া হ'ল। আহা বেচারা বিনা কারণেই দোষী সাব্যস্ত হল। ওর ত দোষ নেই, দোষ ঐ যন্ত্রের, এবং সে যন্ত্র আমরাই ওকে দিয়েছি। সাহেব খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, তার পর বল্লেন, "এস ত আমিন তোমার পকেট দেখি।' পকেট হাত্‌ড়ে আর একটা আইভারি স্কেল বেরোল, সেটা একেবারে নির্ভুল। সাহেব চোখ পাকিয়ে বললেন—'স্কাউণ্ড্রেল!' অর্থাৎ ব্যাপারটা এই, নবী জান্‌ত নক্সাটা তার হয়েছে ভুল। কিন্তু তার ত একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া চাই। তাই সে আগে থেকে একটা খারাপ স্কেল সংগ্রহ করে রেখেছিল, ভুল ধরা পড়লে সে ঐ খারাপ স্কেলের দোহাই দেবে। কিন্তু সাহেব তা ধরলেন কি করে? সাহেব বল্‌লেন প্রথমে তাঁর একটু ধোঁকা লেগেছিল, কিন্তু পরে এই কথা ভাবলেন যে সব আমিনেই আগে যন্ত্রপাতি ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে নেয় ঠিক আছে কিনা, নইলে তাদের কাজে ভুল হবে। নবী নিশ্চয়ই জানত প্রথম স্কেলটা ভুল, জেনে শুনেই সে কি ঐ ভুল স্কেলে কাজ করবে? বল্‌লেই ত বদলে পেত। কাজেই বোধ হ'ল তার কাছে একটা ভাল স্কেল আছে। তৎক্ষণাৎ নবীর চাকরী গেল।

ইন্‌স্‌পেক্‌সান্ পর্ব্ব শেষ হতে সাহেব বললেন,—ঐ যে দামোদরের এক খাল দিয়ে স্বচ্ছ জল কুলকুল করে চলেছে ঐখানে স্নান করবেন। আমি লোকজন সরিয়ে দিলাম। সাহেব পোষাক ছাড়তে লাগলেন। আমি বল্‌লাম, "এমন দুর্গম জায়গা আর দেখিনি। ইংরেজ রাজত্বে কোল্‌কাতার এত কাছে

এমন জায়গা যে থাকতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।” সাহেব বল্লেন, ‘ইংরাজ রাজত্বের দোষ দিওনা বাপু। এখানে আছে কি যে এখানে পয়সা খরচ করে রাস্তা বানাতে যাবে? নইলে যদি সোনা পাওয়া যেত ত এ অঞ্চল ত ছার—ইংরেজ চন্দ্রগ্রহে যাবারও পথ বার করত। কোল্‌ডিষ্ট্রিক্টে-কখনও গেছ? দেখবে সেখানে কত দুর্গম পাহাড় জঙ্গল ভেদ ক’রে রাস্তা ও রেল রাস্তা বানানো হয়েছে। সেখানেও এই দামোদর আছে, তার ওপর কি চমৎকার পোল, দেখেছ? তুমি জাননা বোধ হয় সে পোল আমারই পিতামহের কীর্ত্তি।’

এ কথা জানতাম না। ওই যে বিরাট দামোদর নদ ওর পরাভব ঘটেছে এঁরই পিতামহের হাতে। দামোদর কি একথা জানে? আমরা অবিশ্বাসী, নদীর আত্মা আছে বিশ্বাস করিনে। তবু এই দামোদরের স্ফীত উদ্দাম মূর্ত্তি আমি দেখেছি, এর ক্রুদ্ধ হিংস্র গর্জ্জন আমি শুনেছি। তখন মনে হয়েছে এ যেন এর পরাভবের গ্লানিতে ক্ষিপ্ত, এর অবমাননাকারী মানুষকে দ’লে পিষে ডুবিয়ে পচিয়ে মারতে যবন সেনার মত এ যেন হৈ হৈ ক’রে ছুটে চলেছে।

সাহেবকে স্নানের অবসর দিয়ে—আমি খালের পার দিয়ে উত্তর দিকে চল্‌লাম নিকটের এক গ্রামে কাজ দেখতে, গ্রামে ঢুকতেই একজন লোকের মুখে শুনলাম এ অঞ্চলে ভয়ানক কলেরা হচ্ছে, মৃতদেহ পোড়াবার পর্য্যন্ত লোক নেই। এই একটু আগেই দুটো কলেরার মড়া এইখানে ভাসিয়ে দিয়ে চলে

গেছে, দাঁড়িয়ে পড়্লাম! দক্ষিণের দিকে চেয়ে দেখি দূরে খালে সাহেব স্নান কর্ছেন, আর তাঁরই কাছে ঐ দু'টো কালো কালো ও কী!—মড়াইত! সর্ব্বনাশ, কলেরার মড়া, জলের ওপর, অত কাছে। প্রাণপণে ছুটলাম চেঁচাতে চেঁচাতে—"উঠুন উঠুন, এখনি উঠে পড়ুন।"

বেলা তিনটে হ'তে সাহেবের ভেদবমি সুরু হ'ল। পাগলের মত সাইক্লে ছুটেছেন, মাঝে মাঝে নামছেন, বমি করছেন, আবার উঠ্ছেন—আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে সে কী লড়াই। চোখ দু'টো বেরিয়ে আস্ছে, হাত দু'টো প্রাণপণ বলে সাইক্লের গ্রিপ্ ধরে আছে, থেকে থেকে কেবল জিগেস কর্চ্চেন—'আর কতদূর আর কতদূর।' নিকটতম রেল ষ্টেশন যেখান থেকে মার্টিন কোম্পানির রেল সুরু হয়েছে—সে হল এখনও ষোল মাইল, কিন্তু তা বল্‌তে প্রবৃত্তি হচ্ছে না, মিছে করে বলছি, ,আর চার মাইল,' এই এসে গেল ব'লে।' তাঁর পা আর চলেনা, বললাম পাল্কীতে চলুন। পাল্কীতে চড়্বেন না, বড় আস্তে চলে। আর একবার বমি কর্‌বার জন্যে সেই যে নামলেন আর উঠলেন না, হাত পায়ে খিল্ ধরতে লাগল। আমি দৌড়ে গিয়ে পাল্কী ডেকে নিয়ে এলাম, তাঁকে তাতে তুলে বেয়ারাদের বললাম, 'চল্ যত জোরে পারিস। মূল্যবান প্রাণ বাঁচিয়ে দে। এমন বক্‌শিষ পাবি যা জীবনে প্রত্যাশাও করতে পারতিস না।' পাল্কী-বেয়ারারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল।

এই কি দামোদরের প্রতিশোধ! এখানকার্ আব্‌হাওয়াও

বিষাক্ত ব'লে বোধ হ'তে লাগল। সেই বেনা বন, সেই বালিয়াড়ি, সেই খাল, বিল, জঙ্গল, আমাদের দিকে চেয়ে বিদ্রূপ করছে। বুনো ভাঁটফুল তার ঘৃণিত সাদা সাদা কেশর দুলিয়ে নাচতে লাগল। শেয়ালগুলো চীৎকার করতে লাগল অসভ্য হোটেন্‌টট্‌দের মানুষ খাবার বিজায়োল্লাসের মত। বিকট হেঁদাল গাছের দল তাদের জটা দুলিয়ে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াতে লাগল, অন্ধকার বাঁশবনে সে কী চাপা হাসির ফিস্ ফিস্ শব্দ! কানানদীর খাত দিয়ে চলবার সময় গভীর বালি আমাদের পায়ে দিল বেড়ি পরিয়ে। বিছুটির বন মারল শপাং শপাং করে চাবুক। আজ সমস্ত প্রকৃতি যেন এক সাথে রুখে দাঁড়িয়েছে আমাদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে।

এই ক'টি মানুষ তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করল কেবল চলার দিকে। মন থেকে আর সব অনুভূতি মুছে গেছে, শরীর ক্লান্ত, স্বেদসিক্ত,—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই খালি একমাত্র কথা—'চল্ চল্'। পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে চলে, কক্ষচ্যুত তারা যেমন মহাশূন্যে চলে, আর কোনও ধ্বনি নেই, ছন্দ নেই, কেবলই চলা। মনে কোনও স্মৃতি নেই, সম্বিৎ নেই, শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে,—কেন যে চলেছি তাও যেন ভুলে গেছি। হঠাৎ পাল্কী বেহারাদের কথায় চমকে উঠে দেখি ষ্টেশনে এসে পৌঁছেচি। পাল্কীর ভেতর ঝুঁকে দেখি...প্রকৃতি তার বলিদান আদায় করতে ছাড়ে নি, আরোহীর দেহ অসাড় নিস্পন্দ, হাত মুষ্টিবদ্ধ, চোখ দু'টা বেরিয়ে এসেছে, দাঁত দু'পাটি

২

কামড়াতে আসছে···আমরা ক'টি মানুষ যেন চাবুক খেয়ে লাফিয়ে উঠলাম।

কিন্তু যে মানুষের ধারা সৃষ্টির আদিম কাল থেকে বিশ্বকে জয় করতে বেরিয়েছে সে মানুষ চাবুক খেয়ে দমবে না। তার যে অস্থিমাংসের শরীর,—তাকে লাগে, কিন্তু তার যে আত্মা সে আঘাতেও দুর্দম, পরাজয়েও অনমনীয়। যেখানে বাধা এসে তার পথ আটক করে, সেখান থেকেই তার মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ খোলা সুরু হয়,—যেখানেই সমস্যা এসে বাঁধ তুলে দাঁড়ায় তারই তলে তলে তার চিন্তার ধারা তরঙ্গায়িত হয়ে ফুলে ওঠে একদিন ঐ বাঁধ চূর্ণ করবার জন্যে। যেখানেই মৃত্যু এসে ভয় দেখায় সেখানেই জন্ম হয় অফুরন্ত প্রাণের। চেয়ে দেখলাম দামোদরের বিকট বালু হলদে ছ্যাতলা দাঁত বার ক'রে হা-হা করে হাসছে। আজকে এই ম্লানাচ্ছায়া প্রদোষে এই যে ক'টি মানুষের নিদারুণ পরাজয় ঘটল,—ঠিক জানি এ ব্যর্থ হবে না। —এরই বার্তা যাবে বাংলাদেশের মানব সভার দ্বারে দ্বারে—ডেকে আনবে অপরাজেয় নির্ভীক অন্তহীন মানুষের ধারাকে, যারা মৃত্যুনাগিনীর ফণায় চড়ে নাচবে, যারা আপন অদম্য শক্তির তেজে চূর্ণ করে দেবে প্রকৃতির এই নিষ্ফল আড়ম্বরকে। তাদের কুঠারের ঘায়ে মহাদ্রুম খণ্ড খণ্ড হয়ে উড়ে যাবে, বনভূমি অনলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে,—তারা এসে এই হতভাগা দেশের হতভাগা অধিবাসিদের ঘোচাবে বন্ধন,—যে পথে আমরা আজ বাধা পেলুম, আঘাত পেলুম—সেই পথ দিয়ে ছুটবে তীরবেগে

মানুষের জয়

মানুষের রথ—এই বন্যাক্রান্ত দেশের দিকে দিকে উঠবে মানুষের জয়ের গান। সেই অনাগত বিজয় বারতা হয়ত আমার কানে পশবে না, আমি হয়ত চলে যাবো এই পরাজয়ের কলঙ্ক কাহিনী নিয়ে—কিন্তু তবুও বলি,—জয় মানুষের জয়।

ভবিতব্যতা

বিয়ে বাড়ীর আলোর মালার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশে মেঘের মেলা সেদিনে; শ্বেতপদ্মের আলপনা-আঁকা চন্দনকাঠের আসনে রক্ত-বসনা বধূ একা বসে ভাবছে,—বাহিরের কোলাহলে তার মন নেই,—উদ্বিগ্ন নয়নে আকাশভরা আঁধারের পানে চেয়ে কী সে ভাবছিল।

বিবাহোপলক্ষ্যে দেশের পরিচিত নীড় হতে অনভ্যস্ত নগরীর নারীর বদ্ধ বক্ষপুটে প্রবেশ করে অবধি সুনন্দার অস্বস্তির শেষ ছিল না; চারিদিকের অপরিচিতের মাঝে একমাত্র পরিচিত শুধু তার পিতা,—সে তাঁর কাছেই ঘেঁসে থাকত। মাকে সুনন্দার মনে পড়ে না, কোন্ শিশুকালে তিনি তাকে ছেড়ে গেছেন; পিতার কাছেই পালিত সে। চন্দ্রনাথের বয়সের সঙ্গে শরীর ভেঙে আসায় তিনি বিষয়কর্ম্ম দেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন; তাঁর পুত্র উমানাথ এখন জমিদারী পরিচালনা করেন। তিনি অধিকাংশ সময় কলকাতায় থাকলেও মহল পরিদর্শন থেকে মকর্দ্দামা তদ্বির করা প্রভৃতি সমস্ত ভারই অর্পিত ছিল তাঁর ওপর। চন্দ্রনাথ দেশকে ছাড়তে পারেন নি। মায়াপুরে বনেদি ধরণের বৃহৎ অট্টালিকা,—পূর্ব্বের জৌলস নেই, পূর্ব্বের

আয়তন এখনো বজায় আছে। কয়েকজন দাসী-পরিচারক আশ্রিত নিয়ে পিতাপুত্রীর সেই গ্রামের বিজনে দিন কাটে।

বিবাহের দু'দিন আগে সুনন্দাকে নিয়ে চন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেন। উমানাথই সব আয়োজন করেছিলেন, তিনিই কর্ম্মকর্তা। কিন্তু চন্দ্রনাথের আসার পরদিনই উমানাথকে কলকাতা পরিত্যাগ করতে হল। পূর্ব্বসীমার মহলে পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের সঙ্গে কি নিয়ে দাঙ্গা বেধেছে খবর পেয়ে তিনি তদারক করতে ছুটলেন। চন্দ্রনাথের ওপর এতবড় আয়োজনের ভার পড়ায় তিনি বিব্রত হয়ে উঠলেন; অপরিচিত লোকজন নিয়ে এ সমস্ত সামলানো তাঁর পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হয়ে দাঁড়াল। বহুদিন হতে নির্লিপ্ত শান্তির মাঝে বাস করে এসব সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে তিনি এখন অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বিয়ের দিন সকাল হতে চন্দ্রনাথ অসুস্থ বোধ করছিলেন তবু কোন মতে যথাকর্ত্তব্য করে গেলেন; সারাদিনের উপবাসে পরিশ্রম সহ্য হল না। সন্ধ্যাবেলা তিনি মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। খবর শুনে সুনন্দা উৎকণ্ঠায় দিশেহারা হয়ে গেল,—এ সব উৎসব-সজ্জা টেনে ফেলে দিয়ে চেতনাহীন চন্দ্রনাথের শয্যাপার্শ্বে মন তার ছুটে যেতে চাইল,—বাধা পেয়ে সে বিবাহটার পরেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল,—বিবাহের আয়োজনগুলো তার কাছে একান্ত বিরক্তিকর, সমস্ত অনুষ্ঠান অর্থহীন লাগতে লাগল।

চন্দ্রনাথের অসুস্থতায় কাজকর্ম্ম সব বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। আত্মীয় অনাত্মীয়ের সংখ্যা অগণ্য, কিন্তু সকলেই বিবাহোপলক্ষ্যে

দুদিনের জন্যে এসেছেন নানা জায়গা থেকে,—মায়াপুরের নিঃসঙ্গ জীবনে অধিকাংশকে সুনন্দা দেখেই নি কখনো, যাদের বা দেখেছে তাদের সাথেও স্বল্প-পরিচয়। কিন্তু বিবাহ স্থগিত থাকতে পারে না,—কর্ত্তাহীন কর্ম্ম কোনো মতে এগিয়ে চলল।

একলা ঘরে বসে বসে বাহিরের কোলাহল শুনে সুনন্দার মায়াপুরের সে শান্ত নীরবতা মনে পড়ছিল।—নিত্য ভোরে যখন জলের মত স্বচ্ছ টলটলে আকাশে গোলাপী আভা ছড়িয়ে যায়, সুনন্দা উঠে দেখত মন্দিরের ত্রিশূলে আলো পড়েছে, বেণুবনের মাথায় মাথায় আলো এসে লেগেছে, দীঘির আঁধার জলে রঙের কাঁপন জেগেছে,—সুনন্দার কাজে অকাজের সারা-দিনের ছন্দটি যেন নীরবে বেজে উঠল এদের মাঝে।—তার আঠারটি বছরের স্মৃতির লিপিকায় সে দীঘি, দেবালয়, মুকুলিত আম্রশাখা, মর্ম্মরিত বেণুবন প্রতি দিনে কত মধুবিন্দু জমিয়ে গেছে।…বিদ্যুৎকে চমকে দিয়ে মেঘ ডেকে উঠল,—মেঘান্ধকার আকাশকে দেখে সুনন্দার মনে জাগল—সেই পল্লীজ্যোৎস্না; উত্তপ্ত গ্রীষ্ম-দিনের শেষে অলিন্দে শীতলপাটি বিছিয়ে চন্দ্রনাথ তাকে নিয়ে বসতেন; আমের মুকুলের গন্ধে বাতাস মাতাল, বকুল বটের মসৃণ পত্রপুঞ্জে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে, চোখগেল'র জ্যোৎস্নাসিক্ত সুর থেকে থেকে জেগে উঠত; পিতাপুত্রীর আলোচনার মৃদুগম্ভীর গুঞ্জন জ্যোৎস্না-ধ্যানী রাতের সাথে মিশে যেত। চন্দ্রনাথ চাইতেন সুনন্দার স্বাতন্ত্র্য কোথাও যেন ব্যাহত না হয়,—দিনের আলোর মত সহজ তার প্রকাশ হোক।

উমানাথের এসবে বিশ্বাস ছিল না, তিনি ছিলেন অন্য প্রকৃতির। সুনন্দাকে এতদিন অবিবাহিতা রাখায় তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল। তিনি বহুবার তার বিবাহের সম্বন্ধ এনেছেন, কিন্তু চন্দ্রনাথ প্রতিবারেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। এবারে উমানাথ সম্বন্ধ আনলেন কোন্ রাজবাড়ী থেকে।—ভারী বনিয়াদি বংশ নাকি, হাতীশালে এখনো হাতী বাঁধা আর ঘোড়াশালে ঘোড়া। পাত্র অত্যধিক বিদ্বান শিক্ষিত নাই বা হল,—তাদের ত আর চাকরী করে খেতে হবে না। বাপের অবর্ত্তমানে অত বড় জমিদারির সেই এখন মালিক। এত বড় ঘরে কুটুম্বিতা করা বড় সোজা কথা নয়। এতেও চন্দ্রনাথ সম্মত না হলে উমানাথ যে ভগ্নীর আর কোনো বিষয়ে থাকবেন না এ কথাটা পুনঃ পুনঃ বলে দিলেন।

চন্দ্রনাথ অমত করতে পারলেন না। মেয়েকে এবার যখন পরের ঘরে পাঠাতেই হবে তখন অনর্থক দেরী করে এমন সুপাত্র হাতছাড়া করে কি লাভ। উমানাথ সোৎসাহে কলকাতায় ফিরলেন কথাবার্ত্তা পাকা করে ফেলতে। কয়েক দিন পরে জানালেন সুনন্দার বিয়ের সমস্ত স্থির করে ফেলেছেন। বরের এক মামা সুনন্দাকে আশীর্ব্বাদ করতে শীঘ্রই মায়াপুরে যাবেন, সেই সঙ্গে আর একদলও যাবে মালতীকে আশীর্ব্বাদ করতে। তাঁদের আশ্রিতা বিধবা খুল্লতাত-পত্নীর কন্যা মালতী, উমানাথ তার কথাও ভোলেন নি।—এ সম্বন্ধটি তিনিই কোথা হতে জুটিয়েছেন; কিছু তাদের বরপণ দিতে হবে না, পাত্র পশ্চিমে কর্ম্ম করে।

উমানাথ হিসেবী লোক, বুদ্ধি করে ঠিক করেছেন মালতীর বিবাহও সুনন্দার সঙ্গে একরাত্রে সেরে ফেলা যাবে, খরচপত্র প্রভৃতি নানা দিক্ দিয়ে এতে মস্ত একটা সুবিধা, এখন কোনো মতে ছুটি করিয়ে পাত্রটিকে নিয়ে এসে বিয়েটা সেরে ফেলতে পারলেই বাঁচা যায়।

কক্ষের একপ্রান্তে আর একটি কনেকে কখন বসিয়ে দিয়ে গেছে। সঙ্কুচিতা শ্যামা মেয়েটি, চন্দ্রের আকর্ষণে উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের মত নানারকম ফিতে জড়ানো চক্রাকার খোঁপাটির আকর্ষণে চুলগুলি সব নিঃশেষে সামনে থেকে সরে পিছনে জমেছে এসে। কপালে তার কাঁচ পোকার টিপ, নাকে নোলক। এত গোলমালে বেচারা আরো আড়ষ্ট জড়সড় হয়ে বসে আছে। বরের কথা শিশুকাল হতে সে কত না শুনেছে,—তার বরটি কেমন হবে? গঙ্গাজলের বরের মত তাকে সেই পাখী-আঁকা কাগজে যদি চিঠি দেয়! ভাবতে ভাবতে এক একবার তার ঢুলুনি আসছে।

ঘন ঘন শঙ্খরোলে বরের আগমন প্রচারিত হল, বারিধারার প্রবল বর্ষণে উলুধ্বনি ক্ষীণ হয়ে গেল। শঙ্খ শুনে সুনন্দার মন বর্ত্তমানে ফিরে এল,—বিবাহ, চন্দ্রনাথের অসুস্থতা সব ভিড় করে জেগে উঠে তাকে পুনর্ব্বার অশান্তিতে ভরিয়ে দিলে।

দূরসম্পর্কের কে একজন সুনন্দাকে রাজকুমারের হাতে সম্প্রদান করলেন। সভায় চারিদিকের বিশৃঙ্খলা সুনন্দাকে আরো বিমূঢ় করে দিলে। অবগুণ্ঠনে আবৃতা হয়ে সে নিস্তব্ধ

ভাবে বসে রইল, বিবাহের কোনো মন্ত্র তার মনকে ছুঁতে পারল না। শুভদৃষ্টির সময় স্বল্পপরিচিতা ও অপরিচিতা পুরনারীদের চেয়ে দেখার নানারকম অনুরোধ তাকে শুধু ক্ষিপ্ত করে তুলল, পানপত্রের আড়ালে বিনত নয়ন তার চন্দ্রনাথের রোগ-কাতর মূর্ত্তি স্মরণ করে বারবার জলে ভরে উঠছিল কেবল। স্ত্রীআচার শেষে বাসর ঘরে প্রবেশ করে সুনন্দা আর অপেক্ষা করতে পারল না। গাঁটছড়া-বাঁধা ওড়না খসিয়ে রেখে চন্দ্রনাথের কক্ষে চলে গেল,—পশ্চাতে অসন্তোষ বিরক্তির যে ঝঙ্কার উঠল তা শোনার ধৈর্য্য তার ছিল না।

পরদিন প্রাতে বরকনে বিদায়ের সময় পর্য্যন্ত অসময়ের অনাকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি বিদায় নেয় নি। ভুক্তপত্রের রাশিতে কাকের চীৎকার, দাসীপরিচারকদের ক্লান্ত কোলাহল, আত্মীয় অভ্যাগতের অকারণ কলরব, ডাক্তারদের আনাগোনা, চারিধারের অগোছাল জিনিষপত্রের অপরিচ্ছন্ন ভাব ও মহামান্য বরপক্ষীয়দের কল্পিত অবমাননার আন্দোলনের মাঝে বরকনে বিদায়ের ব্যাপার উৎকট গোলোযোগ সৃষ্টি করলে।

অবগুণ্ঠিতা সুনন্দা চন্দ্রনাথের শয্যাপার্শ্ব হতে উঠে এল, আত্মীয়স্বজনের দল ঠেলাঠেলি করে তাকে যে মোটরে উঠিয়ে দিল, সে কোনমতে সেই মোটরে উঠে বসল। কান্নাভরা চিত্তকে তার উদ্বেল করে কত প্রশ্ন যে জাগছিল,—আজন্মের স্নেহ-নীড় ছেড়ে কোথায় সে চলল?—এক অজানার হাতে ভাগ্য সমর্পণ করা, সে কি মনের তারে সঠিক সুরে আঘাত দিতে জানবে?...

এমনি করে কতদিনে কত মেয়ে সুখসংশয়-শঙ্কিত মনে পিতৃ-গৃহদ্বারে অশ্রুরেখা রচনা করে গেছে ;—সুনন্দার বাঁধনহারা অশ্রুধারা সে চিরন্তন চিহ্নতে মিলে যেয়ে তাকে আর একটু স্পষ্ট করে দিলে।

অমিতাভের মা শুভ্র বেশ পরা, সৌম্য তাঁর চেহারা —উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন না জানি ছেলে কেমন বধূ আনে। জ্ঞাতি-কুটুম্ব দিয়ে তাঁর সব আয়োজন করান, তাদের মুখে বধূর যা বর্ণনা শুনেছিলেন তাতে তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি ; সুনন্দাকে দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে কেবলই বলেন, "আমার অমিতের ভাগ্য ভাল, ওমা এমন সুন্দর বৌ হয়েছে!" কন্যাপক্ষে আচম্বিত অসুস্থতায় সব বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে শুনে তিনি দুঃখিত হলেন, কিন্তু তখুনি যেয়ে খোঁজ খবর নেবার সময় কারো ছিল না,—অমিতাভকে কর্মোপলক্ষ্যে মধ্যপ্রদেশের যেখানে থাকতে হয় সেই দিনই তাকে সেখানে ফিরতে হবে, ট্রেণের সময় বয়ে যায়, বরবধূকে যাত্রা করাতে হবে, সকলের ব্যস্ততার অন্ত নেই, দ্রুত কাজ সেরে ফেলার চঞ্চলতা চারিদিকে।

সুনন্দাকে অমিতাভের সঙ্গে আজই দূরে যেতে হবে একথা সে পূর্ব্বে শোনে নি,—কোন্ কথাই বা সে শুনেছে! আর যা গোলযোগ পরপর ঘটেছে সবই বোধ হয় তাতে ওলট পালট হয়ে গেছে। রাজবাড়ীর আড়ম্বরের সম্ভাবনায় সে সচকিত হয়েছিল, —এখানের সাধারণ ধরণ দেখে সে কিছু বিস্মিত হলেও। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। অমিতাভের মায়ের সহজ সস্নেহ ব্যবহার

অনাড়ম্বর অভিব্যক্তি সুনন্দার সংক্ষুব্ধ মনে অনেকখানি শান্তি ঢেলে দিলে। বিক্ষিপ্ত উদ্বিগ্ন মনে বেশী কিছু তলিয়ে দেখবার তার শক্তিও ছিল না।

অনুষ্ঠানে আচারে বধূ দেখার তাড়াহুড়ায়—সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল। পুনর্ব্বার বরবধূ বিদায়ের পালা, আবার সেই যাত্রা করা। অবশেষে কোনমতে ট্রেণে উঠে তবে যেন সুনন্দা নিঃশ্বাস ফেলার সময় পেলে ; প্রচুর গোলমালের মাঝে তীক্ষ্ণ বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছাড়ল। এতক্ষণে এবার একটু সুনন্দা হাত পা ছড়াবার সময় পেলে।

এতক্ষণ ধরে বারবার 'অমিতাভের' আহ্বানটায় কি একটা চেনা সুর সুনন্দার মনে পড়ছিল যেন।...শীতের অগম মধ্যাহ্নে মায়াপুরের আলোছায়ার আলপনা-আঁকা দীঘির ঘাটে বসে সে কতদিন দেখেছে ঘন নীল আকাশের আভা জলে ঠিকরে পড়েছে, নারকেল সুপারিপাতা আলোয় ঝিলমিল করছে, একটুকরো রূপোর মত মাছ লাফিয়ে উঠল, একটা মাছরাঙা প্রজাপতির মত গলা কাঁপিয়ে জলের ঠিক ওপরে ক্ষণেক উড়ে সজনের শাখে স্থির হয়ে বসল—তার গ্রীবার রক্তিম পালক আলোয় মাণিকের মত জ্বলে উঠল, একমুঠো মুক্তোর মত সজনে ফুল জলে ঝরে পড়ল। দীঘির যে প্রান্ত মজে এসেছে সেখানে শেওলার মাঝে শারদলক্ষীর চরণ চিহ্ন দু'একটি শালুক এখনো ফুটে,—তাদের ঘিরে সেই যে কয়েকটি মৌমাছির গুঞ্জন কোন্ কোন্ ঘুমপুরী হতে ভেসে আসা কি যেন না বোঝা সুর,—অমিতাভ নামটা সেই

সুরেই মনকে টানে না? বিবাহের পূর্ব্বে এ নামটা ত তাকে কেউ বলে নি! মনে হতে সুনন্দার ওষ্ঠপুটে একটু হাসি জাগল,—কোন্ কথাটাই বা তাকে বলা হয়েছিল!...জানালার কাছে মুখ রেখে বাহিরের অপস্রিয়মান দৃশ্যপটের দিকে শান্তভাবে সুনন্দা তাকিয়েছিল,—আরও কতদূর—কোথায় গিয়ে যাত্রা তাদের শেষ হবে! চন্দ্রনাথ কেমন আছেন কে জানে!—চন্দ্রনাথের কথা মনে হতেই তার চোখ ভিজে এল, জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। কক্ষে আর দু'জন যাত্রী ছিল, তাদের সামনে অমিতাভ তার দিকে চেয়ে আছে দেখে অনভ্যাসে সুনন্দা বিব্রত হয়ে উঠল। অমিতাভ বলল "দেশ ছেড়ে যেতে ভারি খারাপ লাগে না? আমারও প্রতি বার মন খারাপ হয়ে যায়।"— হেসে বলল—"এবারে ছাড়া অবশ্য।"

অমিতাভের মনে একটা বিস্ময় থেকে থেকে জেগে উঠছিল, সে একদৃষ্টে সুনন্দার পানে চেয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে কি ভাবছিল। সুনন্দাকে চাইতে দেখে বললে "উপবাসে আর গোলমালে মানুষের চোখও মানুষকে ঠকায়। কাল রাতের অন্ধকারে তোমার যা মুখ দেখেছি—আজ মনে হচ্ছে তার চেয়ে কত সুন্দর তুমি!"—মানুষের চারিপাশের আবেষ্টন এমন ধাঁধার সৃষ্টি করে! নইলে কালকের নিশীথের দেখা সেই আড়ষ্ট বস্ত্রের পুঁটলির মাঝে এই অগ্নিশিখার দৃপ্তরূপ লুকিয়েছিল!...

সুনন্দাকে নিদ্রাতুর দেখে অমিতাভ শয্যার বন্ধন মুক্ত করে

চর্ম্মাসনের ওপর বিছিয়ে দিলে। সুনন্দাকে বললে "একটু শুলে ভাল হত—যা হৈ হৈ গেছে।"

এমনভাবে অপরিচিত আবাসে নিদ্রা যেতে সুনন্দা সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত, অমিতাভ বললেও সে শুধু খানিকটা হেলান দিয়ে বসল।

গাড়ীর গতির দোলায় কখন সুনন্দা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেছল জানতেও পারেনি। পরদিন প্রভাতে ভোরের আলোর রঙীন অঙ্গুলি সারা দেহে ছড়িয়ে যেয়ে জাগিয়ে দিল তাকে। তখনও অন্য সকলে ঘুমিয়ে। অমিতাভের শালটা নিজের গায়ে জড়ানো দেখে সুনন্দার কুণ্ঠা লাগল,—অমিতাভের উপাধানটাও পিঠের দিকে ঠেসিয়ে দেওয়া। পাশের চর্ম্মাসনে অমিতাভ বাহুর ওপর ললাট রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটি আলোর রেখা তির্য্যক ভঙ্গীতে তার মুখে এসে পড়েছে, বাতাসে কয়েক গুচ্ছ চুল উড়ছে। উদিত সূর্য্যের দীপ্ত আলোর মাঝ দিয়ে সুনন্দা তাকিয়ে দেখল কি সম্ভ্রমভরা সুন্দর মুখ এই—এ মুখের দেখা কি সে পেয়েছে আগে?—স্নানান্তে সিক্ত কেশে শুচী বস্ত্রে সে যখন শুভ্র শিব সুন্দরের পূজা করেছে তখনই কি এ মুখের ছবি তার অন্তরে অঙ্কিত হয়েছে?—তাই কি অতি আপনার বলে মনে হয় এ মুখ? গোধূলির গেরুয়া আকাশ দিয়ে যখন বকের দল নীড়ে উড়ে গেছে, আমলকীবনের আড়াল দিয়ে চাঁদ দেখা দিয়েছে, তুলসীতলায় প্রদীপ শিখাটি কেঁপে কেঁপে উঠেছে—তখন তার আপনভোলা মন কি এরই স্বপ্ন দেখেছে! গৃহ-

প্রত্যাগামী গোদল সাথে রাখালের পূরবীর বাঁশী, দেবালয়ের বিলীয়মান ঘণ্টাধ্বনি, পল্লীবালার সন্ধ্যাশঙ্খের মিলিয়ে যাওয়া সুর তার মনে ত এরই আগমনী বাজিয়েছে!—কতদিনের রঙ বোলানো মনের আকাশে অমিতাভ কি আজ আলোর রূপে এল? এতদিনের ছন্দে বাঁধা চিত্তবীণায় এবার কি সে সুর জাগালো?...

অমিতাভ চোখ মেলে সুনন্দা তার দিকে চেয়ে আছে দেখে হেসে উঠে বসল।

গৃহে পৌঁছলে দেশীয় দাসী ভৃত্যেরা হাসিমুখে সুনন্দাকে অভ্যর্থনা করে নামালে। তাদের ভাষা, তাদের দেশ সবই সুনন্দার রহস্যসুন্দর লাগছিল।

অমিতাভের ব্যস্ততার সীমা ছিল না, সুনন্দাকে কোথায় বসাবে, কি করবে সে যেন ভেবেই পাচ্ছিল না। বেশীক্ষণ কাছে বসবার অবসরও নাই, অথচ কাছে পাওয়ার আগ্রহ অসীম। তার অতিরিক্ত ব্যগ্রতায় কুণ্ঠিত হলেও সুনন্দা মনে মনে পুলক পাচ্ছিল। সারা দ্বিপ্রহরটা সে আপন মনে ঘুরে বেড়াল। আকাশের সীমাছোঁয়া তৃণবিরল মাঠ, কত দূরে নীলাভ একটা পাহাড়, তালীবনের মাঝদিয়ে বিশীর্ণ নদীর বালুবক্ষে জলের রূপালি রেখা। একদিকে ফুলের আগুনলাগা সরষে ক্ষেত;—কপিক্ষেতে গরু দিয়ে জল টেনে দেওয়া। সামনের উদাসী পথ আপনমনে কোথায় চলে গেছে, রঙীন শাড়ী পরা কজ্জলদেহা মেয়েদের সে পথে আনাগোনা, চলার তালে

তাদের কোঁচার ফুল কেঁপে উঠছে, সুনন্দা বিস্ময়োজ্জ্বলনয়নে তাকিয়ে দেখছিল।

অমিতাভ সমস্ত দিন বাদে সেইমাত্র গৃহে ফিরেছে, সুনন্দা তখন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিল, হঠাৎ বলে উঠল, "একি দাদা আসছেন যে"। উমানাথ উদ্যান পথে জোরে হেঁটে আসছেন। অমিতাভ তাঁর পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে তাঁকে এগিয়ে আনতে নেমে গেল।

সুনন্দা শঙ্কায় পাংশু হয়ে গেল, চন্দ্রনাথ কেমন আছেন ভাবতেও তার সাহস হচ্ছিল না। উমানাথ প্রবেশ করতেই ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা কেমন আছেন ?"

তার বিকৃত সুরে উমানাথও একটু চমকে উঠেছিলেন, তারপর বলে উঠলেন, "বাবা, ও বাবা কতকটা সামলেছেন। ও অসুখ কি আর সারবে, কিন্তু তোমায় এখনই আমার সঙ্গে চলে আসতে হবে।" শেষের দিকে স্বরটা তাঁর ভয়ানক গম্ভীর আদেশমূলক শোনাল।

অমিতাভ জিগ্‌গেস করল, "কেন ?"

খেঁকিয়ে উঠে উমানাথ বললেন, "কেন! এতক্ষণে জিগ্‌গেস করার ফুরসৎ হ'ল, কেন! তোমার বিয়ে হয়েছে আমার কাকার মেয়ে মালতীর সঙ্গে তা কি জান না! ন্যাকা! আর এই সুনন্দা আমার বোন, তার বিয়ে হয়েছে জগৎপুরের কুমারের সঙ্গে এও কি তোমায় বলে দিতে হবে ? বর-কনে বিদায়ের সময় সুনন্দাকে ওরা ভুল ক'রে তোমার গাড়ীতে তুলে দিয়েছে—আর মালতীকে

দিয়েছে জমিদার বাড়ির গাড়ীতে। তোমার কলকাতার বাসায় তোমায় না পেয়ে বরাবর এখানে চলে আসছি আর কেন! এর ওপর আর কিছু বলবার দরকার আছে ?"

সুনন্দা ও অমিতাভ দুজনে বজ্রাহতের মত বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিবাহ সম্বন্ধে অমিতাভ কতকগুলো নিজস্ব মতামত গড়েছিল। বন্ধুদের সঙ্গে মেয়ে দেখতে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করার প্রথা তার মনে অত্যন্ত বিরাগ জাগাত। এ-সম্বন্ধে কিছু বললে বন্ধুরা উত্তর দিত 'বারে! যাকে বিয়ে করব তাকে দেখে শুনে নিতে হ'বে না!' অমিতাভ বলত, 'মেয়েদের কি দেখে-শুনে নেবার সুযোগটা দিয়েছ ?'—আগে ত মেয়েরাই হ'ত স্বয়ম্বরা, অটুট ধনু ভাঙিয়ে, অসম্ভব লক্ষ্য বিঁধিয়ে শৌর্য্য বীর্য্য পরীক্ষা করিয়ে নিত, বন-অরণ্য সন্ধান ক'রে রণরথ পরিচালনা ক'রে আপন ভাগ্য আপনি চিনে নিত। আর আজ!—বন্ধুরা বলত, 'আচ্ছা দেখা যাবে নিজের বেলা কি কর।'

পণ নেবনা বলেও প্রাণপণে শোষণ করা দেখে দেখে অমিতাভ ভাবত সে যদি বিয়ে করে, এমন ঘরে করবে যাদের শোষণোপযোগী সংস্থানও নেই।

মালতীর সঙ্গে বিবাহের যখন সম্বন্ধ আসে, মাতার অনিচ্ছাতেও সে রাজী হয়। মেয়ে দেখতে যাওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রথম হতেই সে অসম্মতি জানিয়ে দিয়েছিল। এ রকম

না দেখে শুনে বিয়ে করেও এমন বধূ হয়েছে দেখে অমিতাভের মাতার আনন্দের শেষ ছিল না।

উমানাথ পুনরায় আরম্ভ করলেন, 'যেখানে আমি না থাকব সেখানেই অঘটন ঘটবে। নইলে এমন ভুলও হয়! এমন একটা লোক ছিলনা যে বর কনেকে দেখে শুনে বিদায় করে! বর পক্ষদের দোষ দেওয়া যায় না, তারা ত কনেদের চেনে না, তা ছাড়া কনেরা ছিল ঘোমটায় ঢাকা, কিন্তু আমাদের বাড়ীর লোকগুলা কি! যত সব অপদার্থ বাঁদরের দল!'

অমিতাভ সুনন্দার কাছে একটা আসন এগিয়ে দিয়ে জানালার ধারে সরে দাঁড়াল।

উমানাথ বললেন, 'আর সঙের মত দাঁড়িয়ে থেকে দেরি ক'রো না বলছি, চল। ওদিকে কত কাজ পড়ে রয়েছে। ওদের বুঝিয়ে হাতে কিছু বড় রকমের নগদ ধরে দিয়ে দেখি কি বলে। আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা ত করতে হবে।'

এতক্ষণে সুনন্দা কথা বললে,—'আর মালতী?'

'ওঃ, তাকে তারা সেই দিনই ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। তখন থেকেই ত হৈ চৈ সুরু হয়েছে। মালতীকে অবিশ্যি আমরা এখানে পাঠাতে পারি যদি ঐ অমরেশ না কি ওর নাম তাকে নিতে রাজী হয়, আর না নেয় ত সে যেমন ছিল আমাদের কাছে তেমনি থাকবে আর কি। মেয়ে মানুষ,—খেতে পরতে পাবে,—তার আবার দুঃখুটা কিসের। দরকার হলে একটা প্রায়শ্চিত্ত করান যাবে না হয়।'

পরাশ্রিতা মালতীর কুমারী নামটা ত ঘুচে গেছে। তাহলেই হল। কিন্তু সুনন্দা, জমিদার ঘরের একমাত্র মেয়ে, তার কথা স্বতন্ত্র। কত সন্ধানে এতবড় ঘরে বিয়ে দেওয়া গেল, তাকে সেখানে না পাঠাতে পারলে সবই বৃথা। সমাজপতিদের মস্তক যথেষ্ট পরিমাণে তৈলসিক্ত করলেই ব্যাপারটা অনেক মসৃণ হয়ে যাবে বৈষয়িক উমানাথের সেকথা বুঝতে বিলম্ব হয়নি। তিনি বললেন, 'চল বেরই। যার হাতে তোমায় সম্প্রদান করা হয়েছে সেই তোমার স্বামী। এ বাড়ীতে থাকার তোমার ত অধিকার নেই।'

অমিতাভ দাঁড়িয়ে ভাবছিল লক্ষ্মীছাড়ার ভাগ্যে এমন লক্ষ্মীকে লাভ করা সম্ভব কি! তার এ দীনগৃহে লক্ষ্মীর স্বর্ণাসন কি প্রতিষ্ঠিত হয় কখনো! উমানাথের কথায় বিচলিত হয়ে বলে উঠল, 'তা বলবেন না, ওঁর উপযুক্ত ঘর আমার নেই, কিন্তু আমার এ সামান্যকে উনি নিজের বলে ভাবলে ভাগ্য বলে মানব।'

উমানাথ ধমকে উঠে বললেন, 'রাখো রাখো,—তোমার ওসব নাকে কাঁদা শিভালৃরি আমার ঢের শোনা আছে।'

তিনজনে নীরব।

সব মিথ্যা, সুনন্দার সব মিথ্যা। আবহমানকালের শুনে আসা রীতি এমন করে তার মিথ্যা হল! অতি-অপরিচিত অজানা একব্যক্তি একসন্ধ্যার মন্ত্রবলে জন্ম জন্মান্তরের নিকটতম হয়ে উঠবে এই চিরন্তন প্রথাকেই ত সে মেনে নিয়েছিল। তাই

ত জীবনের এ নব অধ্যায়ের অতিথিকে যখন সে চোখ মেলে দেখলে তখন এমন সহজে তাকে গ্রহণ করতে পারলে। তার কুমারী জীবনে যে পথিকের আগমন-আশায় প্রদীপ জেলেছে, বিবাহের শুভ-লগ্নেই তাকে সে পাবে, বিবাহের বরসজ্জায় যার আগমন সেই তার জন্মতোরণে হারিয়ে যাওয়া জন-অরণ্য হতে খুঁজে পাওয়া জন্মান্তরের পরিচিত,—এর মাঝে ত সংশয় জাগে নি! অমিতাভকে এই যে তার ভাললাগা,—সে জেনেছে এটা হ'ল বিবাহের মন্ত্রশক্তির প্রভাবে। সে ধারণা এত ভ্রান্ত, এত মিথ্যা হল আজ! এমন ক'রে তাকে প্রতারিত করলে!—আচ্ছা—দশনে সে অধর দংশন করলে। প্রতারণাকে প্রতারিত করবে সে। তার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরশায়ী দেবতা তাকে দিয়ে যার গলায় বরমাল্য পরিয়েছেন, তাকেই সে বরণ করে নেবে, আজন্মের সংস্কার বিবাহের বাহ্য অনুষ্ঠান তার পক্ষে ব্যর্থ হোক্ গ্রাহ্য করবে না।

উমানাথ ডাক দিলেন, 'চলনা সুনন্দা!'

'আমি যাব না।'

বজ্র পড়লেও উমানাথ এত চমকে উঠতেন না। তড়াক্ করে তিনহাত লাফিয়ে উঠে বললেন,—'কি!'

অমিতাভ বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে ফিরে সুনন্দার মুখের দিকে চাইলে।

সুনন্দা বললে, 'আমি যাবনা।'

এতদিন সে সকল সংস্কারকে নির্বিচারে মেনে এসেছে। আজ

দেখেছে প্রতারণার রূঢ় আঘাত বুকে এসে বাজল। আজও কি তার নিজে পথ দেখে চলার সময় হল না! এ নবজীবনের পথ তার জ্যোৎস্না-সরস হবে না নিশ্চয়—রুদ্রের ললাট নেত্রের বহ্নির আলোয় যাত্রা তাদের সুরু, আকাশে তার রঙের লীলা নাই বা রইল, মহাসন্ন্যাসীর বাঁধন-খসা জটার জটিলতা সেখানে দেখে সে ত ফিরবে না!—সে এরই মাঝে সত্যের সন্ধান পেয়েছে, সংস্কার আর কি তাকে বাঁধতে পারে!

বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়ে উমানাথ গর্জ্জন করে উঠলেন—'কি বললে, আসবে না! জান, ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি!'

সুনন্দা মাথা হেলাল।

'কতবড় রাজবাড়ীতে তোমার বিয়ে হয়েছে জান তুমি? তাদের নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জলখায়, জান?'

'দরকার নেই জানবার!'

'নাঃ, তা কেন দরকার থাকবে! শুধু ভুল করে এই যে এখানে চলে আসা এতেই আমাদের কত মাথা হেঁট হয়েছে, কত গুণোগার লাগবে এ শোধরাতে, জান! আমাদেরই ত গরজ, ওদের আর কি!—একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে করতে পারে। এখনি চলে এস বলছি!'

'না।'

ওদের গরজ যদি এত সহজেই শেষ হয়ে থাকে তার গরজও তবে শেষ হয়েছে। দুর্য্যোগ নিশায় অন্ধকারের অপরিচয়ে একজনের সঙ্গে সুনন্দা মন্ত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, তার

পরদিন প্রাতে যার সাথে পরিচয় তাকে নয়ন মেলে দেখে গ্রহণ করে নিলে। এখন শোনে ভুল হয়েছে,—রাত্রের অন্ধকারে মন্ত্রের সম্বন্ধে সম্বন্ধ হ'ল যার সঙ্গে এ সে নয়! নাই হোক, —আজ অকুণ্ঠ আলোর আভায় যার সঙ্গে পরিচয় তারই আবির্ভাব একান্ত সত্য সুনন্দার জীবনে। রাত্রের অন্ধকারে মন্ত্রের পরিচয় দুঃস্বপ্নের মত মিথ্যা হয়ে গেছে এখন।...তাদের এই মিলনে সাহানার সুকোমল সুর বাজবে না, নিন্দা অপবাদের রক্তিম ভৈরোঁ রাগে হবে তাদের পরিচয়। সমাজ তাকে এড়িয়ে যাবে। জন-অরণ্যে এই স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন তাকে কাঁটার মত বিঁধবে। বিঁধুক তা।...

ক্রোধে কম্পিত হয়ে উমানাথ বললেন, 'না! বটে! তুমি রাজবধূ হতে চাও না, তুমি আমাদের ত্যাগ ক'রে, সমাজ ত্যাগ করে এখানে এই স্বেচ্ছাচারে থাকতে চাও!'

অমিতাভের ললাট লাল হয়ে উঠল। সে নিজেকে সাম্‌লে রাখলে।

সুনন্দা অতি সংক্ষেপে জবাব দিলে, 'আমি এখানেই থাকব।'

কয়েক মুহূর্ত্ত বিমূঢ় থেকে উমানাথ চেঁচিয়ে উঠলেন,—'হবে না! মেয়েকে ধেড়ে-কেষ্ট করে রাখবার ফল ফলবে না! তখনি আমি পই-পই ক'রে বাবাকে বলেছি,—এবার এই স্বাধীনা স্বেচ্ছাচারিণী মেয়েকে বাবা সামলান। ছিঃ ছিঃ, কি কেলেঙ্কারি! আমি কিছু জানি না!' তারপর সহসা সুর কোমল ক'রে বললেন, 'লক্ষ্মী বোন, এখনো বলছি চলে এস দিদি।'

'না দাদা।'

উমানাথ আবার জ্বলে উঠে বললেন, 'তোমার মুখদর্শনেও পাপ! আমাদের কাছে আজ থেকে তুমি মরে গেলে। কখনো যেন তোমার মুখ দেখতে না হয়।'

ছোটখাট একটা ঘূর্ণীর মত ক্ষিপ্রভাবে উমানাথ বেরিয়ে গেলেন।

কক্ষ নিস্তব্ধ।

অমিতাভ এতক্ষণ নীরব হয়েছিল। তাহার ক্রোধের কোনো প্রকাশ শুধু সুনন্দা থাকায় করতে পারে নি।

এগিয়ে এসে ধীরে বললে, 'সুনন্দা, কিসের জন্যে সব ছাড়লে? সারা জীবন ঝড়-ঝাপটে যুঝে চলতে পারবে কি?'

সুনন্দা হীরের মত দীপ্ত দুটি চোখ অমিতাভের মুখের ওপর রাখলে। প্রলয় ঝঞ্ঝাকে সে ভয় করবে না। যিনি প্রলয়ঙ্কর, তিনি তাকে পথ দেখালেন, রিক্ত হয়ে সে যাত্রী হল, এ যাত্রা কি ধ্রুব হবে না? আস্তে থেমে বললে, 'তুমি আমায় সাহায্য করবে?'

অমিতাভ নত হয়ে বললে, 'এত বাধাকে জিতে তুমি আসবে, একি কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম! তুমিই আমার সাহায্যে হাত বাড়ালে সুনন্দা, কতদিনের কর্ম্মশুদ্ধির পর আমি পৌঁছাব তোমার কাছে সে কি বলতে পার?' সে তার বিস্ময় সম্ভ্রমভরা দুটি চোখ সুনন্দার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের ওপর রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তালীবনের ফাঁক দিয়ে অস্তসূর্য্যের শেষরশ্মি তাদের ললাটে স্বর্ণচন্দন এঁকে দিয়ে চলে গেল।...

কয়েকদিন পরে চন্দ্রনাথের একখানা চিঠি এল। তিনি সুনন্দাকে লিখেছেন,...'আমরা গড়েছিলাম এক, বিধাতা তাকে এই ভুল দিয়ে ভেঙে গড়লেন অন্য। তুমি তাঁর এই নূতন গঠনকেই গ্রহণ করে নিলে; লোকাচারের নিয়ম তুমি মানলে না, নিজের জীবনপথ নিজে নির্ব্বাচন করে নিলে। আমার কিছু বলবার নেই মা। তবে মানুষের আশীর্ব্বাদের যদি কোনো অর্থ থাকে তাহলে আমার আশীর্ব্বাদ, যে-সত্যকে গ্রহণ করলে তাকে পালন করবার শক্তি যেন তোমাদের অটুট থাকে চিরদিন...।'

অসাংসারিক চন্দ্রনাথ কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেই ক্ষান্ত হলেন। সাংসারিক উমানাথও ভগিনীর হিতৈষী ছিলেন। সুনন্দাকে চিঠি লিখে তিনি জানিয়ে দিলেন কেমন করে অমিতাভের সহিত তার মিলন আইন সঙ্গত বিবাহ হতে পারে।

কিন্তু মালতীর কি হবে?

মুক্তি

(Chirikofএর অনুসরণে)

মাঠের মাঝে ছোট্ট ষ্টেশনটি; দুখানি টিনের ঘরকে ছেয়ে বেগুনে-ফুলে ভরা লতাটি উঠেছে, কাঁকর সরিয়ে শীর্ণ দুটো পাতাবাহারের গাছ।

ষ্টেশনের কাছে লাইনের ধারে স্কুল-মাষ্টারের খড়ে ছাওয়া বাড়ী; রোজ সেখানে অপরাহ্নে সুরভি সব কাজ ফেলে গবাক্ষের ধারে দাঁড়ান এসে; কলকাতা থেকে ট্রেণ আসে—সুরভি উৎসুক হয়ে দেখতে থাকেন—দু চারজন লোক ওঠা-নামা করলে, পানওয়ালা একটানা সুরে হেঁকে যায়, একটি লোক শেষ মুহূর্ত্তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে লণ্ঠন, সরাই সব হুড়মুড় ক'রে গাড়ীতে ফেলে সচল পুঁটলির মত অবগুণ্ঠনবতী পত্নীকে শিশুসহ ঠেলে ঠুলে উঠিয়ে দিলে, ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল—একরাশ ধোঁয়া আকাশে ছড়িয়ে ট্রেণ চলে যায়—ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর হ'য়ে বাঁকের আড়ালে লুকিয়ে যায়। সুরভির চোখ অশ্রুতে ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে, যার জন্যে এ সাগ্রহ প্রতীক্ষা, কোথায় সে ছেলে তাঁর! নীলবাসপরা একজন খালাসী সবুজ পতাকা

ঝুলিয়ে সেদিক দিয়ে চলে যায়, সুরভি তাকে ডাক দেন—“হাঁ গা বাছা, এই ত কলকাতার গাড়ী গেল ?”

“হাঁ বুড়ীমা, এই ত।”—সে চলে যায়।

সুরভি আশা ছাড়তে পারেন না—তাঁর কি চোখের তেজ আছে—লোকের ভিড়ে সে আড়ালে পড়েছিল হয়ত, সামনের পথে এতক্ষণ এসে পড়েছে বাড়ীতে ;—এখনি হয়ত বাপে ছেলেয় রাগারাগি হবে, বাপেরই ত অন্যায় বাপু, ছেলেমানুষ মাথার ঠিক রাখতে পারে নি, তা ব'লে অত রাগ করলে চলে ? তিনি তাড়াতাড়ি সামনে যান দেখতে,—উনানে চড়ান ডাল ধ'রে উঠল সে খেয়ালও থাকে না।

বাইরে পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণের একধারে একটা বকুল গাছের তলে জীর্ণ কাষ্ঠাসনে বসে এক বৃদ্ধ হুঁকোটা হাতে ধ'রে ক্ষীণদৃষ্টি সামনের পথে প্রসারিত ক'রে আছেন, এক একবার হাতের হুঁকোটায় টান দিয়ে আবার অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ছেন। সুরভির পদশব্দে ফিরে চেয়ে গলাটা ঝেড়ে বললেন, “কি ? এল না ত ?”

ট্রেণের শূন্য লৌহপথ শেষ সূর্য্যের আলোয় তাম্রবর্ণে জ্বলছে, দুজনে সেইদিকে করুণ চোখে চেয়ে থাকেন।

বৃদ্ধ উঠে পুরাতন চটিতে পা ভরতে ভরতে বললেন, “আমি ত বলেই ছিলাম ; দেখো, এখন প্রাণে বেঁচে আছে কি না ;—ছেলে ছোকরারা কি যে হ'য়ে গেল আজকাল !” লাঠিটা তুলে নিয়ে তিনি ডাক্তার বাবুর বাড়ীর উদ্দেশে বেরিয়ে যান—কোমরে

জোর নেই, কুঁজো হ'য়ে চল্‌তে হয়; একটা পা বাতে পঙ্গু, টেনে টেনে কোনমতে যান।

ডাক্তার বাবু গ্রামের ঔষধদাতা, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণকে পরামর্শটাও তিনি বিনামূল্যে বিতরণ ক'রে থাকেন। তাঁর ভাই সেক্রেটেরিয়েটের কর্ম্মচারী, লোকে জানে সরকারি খবরাখবর সেহেতু তাঁর নখদর্পণে। রোজ ডাকে তাঁর একখানা ক'রে সংবাদপত্র আসে। তাহ'তে তিনি বাস্তব অবাস্তব নানা ঘটনার সংবাদ শুনিয়ে তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয়ে গ্রামবাসিদের অবাক ক'রে দেন। ডাক্তার বাবু দয়ালের বাড়ী প্রায়ই আসেন, ধূমায়িত চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে জাঁকিয়ে ব'সে বলেন, "শুনেছ হে আজ কাগজে কি লিখেছে? কয়েদিদের নাকি ধূলোতে বালিতে মিশিয়ে খেতে দেবে এবার।" তারপর তিনি সংবাদপত্রের বিবরণের সঙ্গে অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ মিলিয়ে ফেলে নিজের নানা কল্পনা জুড়ে দিয়ে তার সঙ্গে এমন সব লোমহর্ষণ ব্যবহারের কাহিনী রচনা ক'রে বলেন যা শুনে দ্বারের অন্তরালে সুরভি শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করেন, দয়াল ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করেন—তাঁর ছেলে যেন প্রাণে বেঁচে থাকে। এই সব বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখে সারারাত বৃদ্ধ দম্পতি চম্‌কে চম্‌কে জেগে ওঠেন।

দয়াল চ'লে গেলে সুরভি দূর দিগন্তে দৃষ্টিমেলে ভাবছিলেন ওই যে নীড়ে ফেরা পাখীর দল উড়ে চলেছে ওই দিক পানেই কি কলকাতা?—যেখানে তাঁর স্নেহের নিধি আছে? সূর্য্যাস্ত-

রঙীন আকাশ, বিসর্পিত রাঙা পথে ঘরে ফেরা গরুরদল—তাঁর সামনে হ'তে সব মিলিয়ে যেয়ে জেগে ওঠে এক শিক্ষার্থী যুবার মুখ। গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে তিনি সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালতে যান।

সেদিন দয়াল কাজে বেরিয়ে যাবার পর সুরভি তরকারি কুটছিলেন ব'সে। ধূলি-ধূসরিত একটা চর্ম্মাধার নিয়ে পার্থ দাঁড়াল এসে;—বিশুষ্ক মুখে বিপর্য্যস্ত কেশ এসে পড়েছে; চর্ম্মাধারটা নামিয়ে রেখে সুরভিকে এসে প্রণাম করল। সুরভির হাত হ'তে অকর্ত্তিত তরকারি খসে পড়ল; প্রথমে যেন এ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ছেলেকে বুকে চেপে তাঁর চোখে কেবলই জল ঝরতে লাগল, রুদ্ধস্বরে বললেন—"এসেছ বাবা ফিরে!"

তাঁর প্রশ্ন আর শেষ হয় না। 'কেমন ছিলে', 'কবে ছাড়া পেলে', 'কখন এসে পৌঁছালে'—'আমাদের ভাবনার কি আর শেষ ছিল'—'আবার যে তোমায় দেখব এ আশা কি আমরা করতে পেরেছিলাম'। পার্থের গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, "আহা বাছারে, মুখ যে একেবারে শুকিয়ে গেছে। পোড়াকপাল আমার, কেবল বকেই মরছি। যাও বাবা হাত মুখ ধোও গিয়ে, আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

ম্লান হেসে পার্থ ঘরে গেল। সুরভির ব্যস্ততায় সে বিব্রত বোধ করছিল। ক্লান্ত দেহ আসনে এলিয়ে সে চারিদিকে চেয়ে দেখল—শৈশবে যেমন দেখেছে আজও তেম্নি,—পরিচ্ছন্ন কক্ষে

পরিপাটি শয্যা, এককোণে ঝকঝকে পিলসুজে প্রদীপ রাখা, বারান্দায় চন্দনার খাঁচাটি ঝুলছে, পরিষ্কার প্রাঙ্গণের প্রান্তে পুষ্পিত করবীর কুঞ্জ, চামেলির ঝাড়টি, প্রাচীর বেয়ে ঝুমকো লতা উঠেছে; জানালা দিয়ে শূন্য মাঠের সীমাহীন প্রসার, জনহীন পথে একটা কুকুর বসে ঝিমচ্ছে, পুকুরে হাঁসের কলরব;—ছেলেবেলায় পার্থ হাঁস তাড়িয়ে পুকুরে নিয়ে যেত, এই ত সেদিনের কথা যেন সে সব। পেয়ারা গাছের শাখে একটা শ্যামা উড়ে এসে লেজ নাচাচ্ছে। পার্থ উঠে জানালায় দাঁড়াল। মেঠো পথে একজন দোলাই জড়িয়ে মুড়ি চিবতে চিবতে চলেছে; পার্থর মন সহসা প্রত্যাগমনের পুলক হারিয়ে উদাস হ'য়ে উঠল;—পুষ্করিণীর বদ্ধ জলের মত কী গতিহীন জীবন এদের, বাহিরের জগতের কর্ম্মময় প্রাণস্রোত এখানে এসে স্থবির হয়ে গেছে। পার্থর জীবনে দুধারার আবর্ত্ত এ,—কর্ম্মমুখর সেই অবসরহীন দিন যেয়ে এতদিন, এখন এখানের এই শান্ত শূন্যতা তার গতিরোধ করল।

সুরভি এসে বললেন, "ওমা, এখনও মুখ ধোওনি,—যাও শিগ্‌গির, আমার ত লুচি ভাজা হয়ে গেল। নারকেল নাড়ু খাবে ত? আগে যে তুমি খুব ভালবাসতে!" পুত্রের প্রিয় খাদ্যটি তিনি সযত্নে সংগ্রহ ক'রে রাখতেন, কোন্ দিন সে এসে পড়বে ব'লে।

পার্থকে খেতে বসিয়ে সুরভি বললেন, "খাও একটু ভাল ক'রে, যা চেহারা হয়েছে বাবা! কেন যে এমন দুর্ব্বুদ্ধি হয়

তোমাদের!” মাছি তাড়াতে তাড়াতে বললেন, “দেখ বাবা, তোমার বাবার কথায় রাগ ক'রো না। বুড়োমানুষ, সব সময় মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন কি? তোমার ওসবে যোগ দেওয়া শুনে বড় রেগে আছেন, দুটো কড়া কথা বললে তুমি চুপ ক'রে যেও। বয়েস হয়েছে, ক'দিনই আর বাঁচবেন বল, বাতে ত পঙ্গু।”

“এত ভুগছেন, কই শুনি নি ত?”

“আর বল কেন বাবা, শরীর ক্রমেই ভেঙে যাচ্ছে। আমিও আর পারি না।”

পার্থ তার মার দিকে তাকাল।—চুলে পাক ধরেছে, মুখে বলিরেখা, শীর্ণ শিরাবহুল হাতদুটি—সে একটা নিশ্বাস ফেলল। অপরাহ্নে দয়াল ফিরলেন। পুত্রের আগমন সংবাদ আগেই শুনেছিলেন, গম্ভীর ভাবে গৃহে প্রবেশ করলেন। পার্থের প্রত্যাগমনে তাঁর আন্তরিক আনন্দটা বাইরে প্রকাশ করা দুর্ব্বলতা ব'লে তাঁর ধারণা, আর বিপথগামী সন্তানকে কিছু শাসন করাও প্রয়োজন।

পার্থ এগিয়ে এসে প্রণাম করল; তিনি তার মাথায় হাত দিয়ে কিছু নির্লিপ্ত ভাবে বল্লেন, “এই যে, কখন এলে?” কিন্তু তাঁর অঙ্গুলির কম্পন তাঁর মৌখিক নির্লিপ্ততার অনুকূল ছিল না।

পার্থ বললে, “আজ সকালে।”

“খাওয়া দাওয়া হয়েছে ত?”—যেন পার্থ কুটুম্ব এসেছে।

সুরভি এতক্ষণে দয়ালকে দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এলেন। ব্যাপারটা সহজ করে নেবার জন্তে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—"দেখছ, পার্থর কি চেহারা হ'য়ে গেছে, যাক বাপু, এসেছে যে এই ঢের; তুমি তোমার সে সব স্বপ্ন দেখে আমায় যা ভয় দেখাতে,—কত ঠাকুর দেবতার দরজায় যে ধর্ণা দিয়েছি! চল তুমি খাবে চল। পা ধোবার জল রেখেছি। যা ধূলো রাস্তায়!"

দয়াল কোনও কথা বললেন না—সুরভির ব্যস্ততার অর্থ তিনি বুঝেছিলেন। পিতাপুত্রে নীরবে খেতে বসলেন। খানিক পরে দয়াল বললেন—"তুমি আমাদের কাছছেড়ে আর কোথাও যাবে না এই কড়ারে তোমাকে ছাড়ল, না?"

"হাঁ।"

"তা এখন কি করবে ঠিক করেছ?"

"পড়া শোনা আরম্ভ করব ভাবছি।"

দয়াল গম্ভীর হ'য়ে বললেন, "একটি বছর ত নষ্ট করলে। কলেজে তোমার নাম কাটা গেছে, সেখানেও আর নেবে না।"

পরিবেষণ করতে করতে সুরভি বললেন,—"তা না নেয় না নিক, বাড়ীতে বসে পড়াশোনা করবে—"

"তা তো করবে, গিন্নী,—এই বুড়ো হাড় কখানা শেষ হলেই এখন আমি বাঁচি। হুঁ,—পার্থ, তুমি যে এমন করবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কি লজ্জা, কি কেলেঙ্কারি!"

"কেলেঙ্কারি!"

দয়ালের ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ল। রুক্ষভাবে বললেন, "নাঃ, বড্ড

গৌরব! জেলের ঘানি ঘুরিয়ে পিতৃপুরুষের খুব মুখ উজ্জ্বল ক'রেছ। আমি যে এই এতদিন ধরে তোমায় খাইয়ে পরিয়ে ইস্কুল কলেজের মাইনে গুণে মানুষ করলাম, খুব ফলটা হ'ল তার; ভেবেছিলাম তুমি একদিন আমায় ক'রে খাওয়াবে, কিন্তু দেখছি সে আর এ জন্মে নয়।"

ছেলের রঞ্জিত মুখের দিকে চেয়ে সুরভি কথাটা উল্‌টে দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন, "ছেলেকে মানুষ করতে সকলেই টাকা খরচ করে, ছেলের টাকায় ব'সে খাবে এমন লোভ যারা করে তারাই ঠকে শেষে।"

দয়াল একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বললেন, "না, না আমি বলছি—শুধু ওরই ভালর জন্যে ত;—আমরা আর কদিন? আমরা চোখ বোজবার আগে ও যাতে সংসারে দাঁড়াতে পারে সেই জন্যেই বলা,—ও যাতে সুখী হয়।"

শান্তভাবে পার্থ বললে, "সকলের সুখের পরিমাপ ত সমান নয় সংসারে। তোমার যাতে সুখ আমার তা'তে সুখ নাও হ'তে পারে। এ রকম অনৈক্যকে জোর ক'রে এক করবার চেষ্টাই ত অনর্থের মূল জগতে।"—পার্থ আসন ছেড়ে উঠে পড়ল।

সুরভি ব্যস্ত হ'য়ে বললেন—"ওকি, উঠলে যে! কিছুই খেলে না, কোথায় যাচ্ছ বাবা?"

পার্থ বলল, "আর কত খাব মা, যাই একটু ঘুরে আসি।" সে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র সুরভি দয়ালকে ঝাঁঝাল স্বরে বললেন—

"ছেলেটা ফেরামাত্র বুঝি তাকে বাড়ীছাড়া না করলে চলছে না?—শাসনটা না হয় একটু পরেই হ'ত!"

দয়াল হুঁকোটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বিব্রত ভাবে বললেন, "তা আমি কি এমন বলেছি বল?—অন্যায়টা কি বলা হ'ল বাপু?"

পার্থ নিবিষ্টমনে ভাবতে ভাবতে মাঠের পথ দিয়ে গ্রাম ছাড়িয়ে এল; পথের পাশে কাঁটা ফুলের ঝোপ শাখা এলিয়ে পথকে ক্ষীণতর করে' তুলেছে; ভাঁটবন ফুলে সাদা;—একটা সোঁদাল গাছের শাখায় শাখায় ফুলের ফুলঝুরি দুলছে। গ্রামের বাহিরে এসে থেমে পার্থ ফিরে তাকাল; দূর গ্রামের কুটির হ'তে ঘন ধোঁয়া ধূসর হ'য়ে উঠছে। বিলীন দিবার বিরহব্যথায় বিবাগী আকাশের গায়ে গেরুয়া রং লেগেছে,—পূর্বগগনে সন্ধ্যাতারার স্নিগ্ধ সমবেদনার দৃষ্টি। বাব্‌লার ডালে একটা ঘুঘু অনাগত সাথীকে সকরুণে আহ্বান জানাচ্ছে। এই স্তিমিত-জ্যোতিঃ সন্ধ্যায়—দূর দিগন্তের পানে চেয়ে পার্থর মন আবার অবসাদে ছেয়ে গেল,—কী নির্লিপ্ততার দেশ এ! জীবনের উত্তেজনার তপ্ত তরঙ্গএর নিষ্ক্রিয়তা টোটাতে পারে না, বাহিরের চিন্তাধারার শতস্রোত এখানে প্রবেশের পথ খুঁজে পায় না। এরই জড়তা ভাঙাবার জন্যে, এরই উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইতে, এরই কল্যাণের কামনায় কত যোগীর কঠোর সাধনা, কত ব্রতীর কঠোর ত্যাগ,—অথচ অহিফেনসেবীর অর্দ্ধচেতন মনের মত এর জীবনযাত্রা এখনও আবেগশূন্য, অলস।...

মুক্তি

হাটশেষে ফেরা গরুরগাড়ীর সারি চক্রমুখরিত হ'য়ে চলেছে। পার্থ ফিরে চলল।

"পেন্নাম হই, দাদাঠাকুর।"

পার্থ মুখ তুলে দেখে বলল, "এই যে বলাই, সব ভাল ত ?" শৈশবে দুজনে একত্র খেলেছে। পার্থর খেলার নৌকার সে ছিল কর্ণধার, পার্থর বনভোজনে সে হত রন্ধনকার।

বলাই বলল, "সব ভালই দাদাঠাকুর। তোমাদের আশীর্ব্বাদে দুটি ছেলে হয়েছে।"

পার্থ বলল, "সে কিরে ? পড়াশোনা ছেড়ে দিলি এত শিগ্‌গির ?"

বলাই একটু নির্বুদ্ধির হাসি হেসে বলল, "এজ্ঞে, বাবা বললে দোকানে ঢুকে পড়, ন্যাকাপড়া ক'রে আর কি হবে, ঢের হয়েছে। তা, দোকানও বেশ চল্‌ছে।"

বলাই তার দোকানের, তার সংসারের সংবাদ সবিস্তারে শোনাতে শোনাতে গ্রামে পৌঁছে বলল, "একদিন আমাদের দোকানে এসো না দাদাঠাকুর।"

"আচ্ছা যাব এখন।"

বলাই চলে গেল। পার্থর মনে পড়ল শৈশবে নবপঠিত আরব্য-উপন্যাস হ'তে গল্প শুনিয়ে সে বলাইকে বলত "জানিস, আমিও বড় হ'য়ে মস্ত একটা জাহাজে ক'রে বাণিজ্যে যাবো!"

বলাই সোৎসাহে বলত, "আমিও যাবো সঙ্গে।"—তারপর দুজনে কল্পনায় কত সর্পসমাকুল পর্বত হ'তে মণি-আহরণ ক'রে

কত বিকটাকার দৈত্য বধ ক'রে অসহায়া রাজকন্যার উদ্ধারসাধন ক'রে আনত।—আজ বলায়ের কল্পনা তার দোকানের প্রাচীর অতিক্রম করে না, বৃহত্তর জগতের স্বপ্ন সে আর দেখে না। তার চোখের দৃষ্টি সঙ্কুচিত হ'তে হ'তে শেষে এই পল্লীর গণ্ডীর মধ্যে মিলিয়ে গেছে। অনাহারে অর্দ্ধাহারে নিত্যকার ঘৃণ্য কলহে দরিদ্রেরা বাঁচে এখানে, সম্পন্নেরা চণ্ডীমণ্ডপে পরচর্চায় পরম আলস্যে কাল কাটায়, আত্মার সকল রকম চেতনা চিরদিন নিরুদ্ধ এদের দ্বারে।···গোধূলির সোনা মিলিয়ে গেছে,—রাতের অন্ধকারে পার্থ গৃহে ফিরল।

দিন কয়েক পরে দয়ালের সঙ্গে পার্থর আর এক চোট মনোমালিন্য হ'য়ে গেল। অপরাহ্নে ভ্রমণ হ'তে ফিরে পার্থ দেখল প্রদীপের আলোয় চশমা লাগিয়ে বসে দয়াল একখানা খাতার পাতা ওল্‌টাচ্ছেন।—বিরক্ত তাঁর মুখ; কাছে বসে তার মা সুপারি কাটছিলেন, তাঁর সন্ত্রস্ত ভাব দেখেই পার্থ বুঝল তাকে নিয়ে তাঁদের আজ একটা তর্কাতর্কি হ'য়ে গেছে। সুরভি তাকে দেখে বললেন, "এসো বাবা, কোথায় গেছলে?"

পার্থ বলল, "এই নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, মা।"

দয়াল মুখ না তুলে বললেন, "বড়ই পরিশ্রমের কাজটা করা হচ্ছিল।"

পার্থর মুখ তপ্ত হ'য়ে উঠল; সুরভি যেন শোনেন নি, এমনি ভাবে বললেন—"যাই রুটিগুলো সেঁকে ফেলি, রাত হ'য়ে যাচ্ছে।"

কেউ কোন কথা বলল না। খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতা কাটার পর দয়াল খাতাটা ফেলে রেখে বললেন, "তোমায় আমি কতবার থানায় হাজিরা দিতে বলেছি বল দিকি বাপ্? আজ পুলিসের নোটিশ এসেছে। তোমার মৎলবটা কি?—আমায় এই বুড়ো বয়সে হাতে দড়ি পরাতে চাও?"

পার্থ কি বলতে যাচ্ছিল, দয়াল রুক্ষস্বরে বললেন, "থাক্ থাক্, আমায় আর শেখাতে হবে না, নিজের চরকায় তেল দাও। রোজ তোমায় বলি, যাও একবার দারোগা বাবুর বাড়ী, যেয়ে দেখা ক'রে এসো, ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়েছি দুজনে, ধরতে গেলে তোমার কাকার মত,—তা একদিন তুমি গেছ? বাপের কথা শুনবে কেন? তাহলে যে দেশোদ্ধার হবে না!"

বাইরে গলার আওয়াজ শোনা গেল; ডাক্তারবাবু বললেন, "কি হে, কিসের গোলমাল?"

এমন অযাচিতভাবে ডাক্তারবাবুর এসে পড়ায় সুরভি হাঁফ ছেড়ে সানন্দে তাঁর জন্যে চা করতে গেলেন। দয়াল বলে উঠলেন, "এস এস ডাক্তার, এই ছেলে নিয়ে হাঙ্গামে পড়েছি ভায়া, বলছিলাম দারোগাবাবু তোমার কাকাই হন বলতে গেলে, মাঝে মাঝে যেয়ে দেখা করলে দোষটা কি, তা ও যাবে? ওর মানের হানি হয় যে তা হ'লে।"

চিম্‌সে চেহারায় চামচিকের মত ক্যাঁচ্‌কেঁচে গলার স্বরে ডাক্তারবাবু বললেন, "তাত বটেই ত, আরে ওরা হ'ল সব

স্বাধীনচেতার দল, ওদের কথাই আলাদা।” তিনি হাসতে যেয়ে কেশে ফেললেন। এখনি উপদেশ অনুরোধের ধারা বর্ষণ চলবে জেনে পার্থ উঠে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

নিজের ঘরে যেয়েও সে স্থির হতে পারছিল না। বাইরের কালো আকাশের নিকষে অসীমের রহস্যলিপি নক্ষত্ররেখায় লেখা। প্রদীপ নিভিয়ে পার্থ বাতায়নের পাশে এসে বসল,—মনে হচ্ছিল শৈশবের আশ্রয় তার এমন অপরিচিত হ'য়ে উঠল কি করে? পরিপক্ক ফলের পরিণতি বোঁটা হ'তে তার বিযুক্ত হওয়ায়,—পুনর্বার তাকে বোঁটায় জোড়বার প্রয়াস বিড়ম্বনা শুধু। চোখে তার ঘুম এল না সে রাতে। বিগত দিনের নানা স্মৃতির সাথে বিশেষ ক'রে একটি দিনের কথা বারবার তার মনে জাগছিল—সেদিনের স্মৃতিটি তার সকল চেতনাকে সমস্ত বেদনাকে নিবিড় মধুতে ভরিয়ে রেখেছে—পার্থর মনের নিভৃত মণিকোঠায় রাখা আছে সে মণি; গভীর ব্যথায় কখন সে রঙীন হ'য়ে ওঠে, পরম পুলকে কখন সে আলোর মত জ্বলতে থাকে তার অন্তরে।...

কারার নির্জ্জন অবরোধে পার্থর দিন আর কাটে না—মনে হয় এ কটা পাষাণ প্রাচীরের মাঝে চিরদিনের তরে তার জীবন্ত সমাধি হ'ল বুঝি এ। এমন দিনে খবর এল, কে এসেছে দেখতে তাকে। পার্থ ভাবল, কে এল, তার মা? তিনি কি ক'রে জানবেন, কেমন ক'রেই বা আসবেন? তার কোনও বন্ধু? তারাও ত অধিকাংশ অবরুদ্ধ,—আর তাদের সাথে

সাক্ষাতের অনুমতিও হবে না নিশ্চয়। জিজ্ঞাসা করল, "কে এসেছে ?"

জেলার বাবু গম্ভীর হ'য়ে বললেন, "কে এসেছে দেখলেই বুঝতে পারবে। বাজে কথা বলার হুকুম নেই।"

পার্থ নীরবে বেরিয়ে এল, প্রহরী তার হাত শৃঙ্খলিত ক'রে দিল।

জেলার বাবু চলতে চলতে কি ভেবে তার দিকে ফিরে বললেন, "তোমার স্ত্রী বোধ হয়।"

পার্থ প্রথমে অবাক হ'য়ে তার পর হেসে উঠল। জেলার বাবু ব্যস্ত হ'য়ে বললেন—"জেলখানা হাসিতামাসার জায়গা নয়। হাসিঠাট্টা বারণ।"

পার্থ হাসি থামিয়ে বললে, "বোধহয় ভুল হয়েছে।"

বাহিরের দপ্তরের ঘরে জানালার ধারে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢুকে পার্থ এই তন্বঙ্গী তরুণীর পিছনফেরা দেহের পানে চেয়ে বিস্ময়ে পুলকে নির্বাক হ'য়ে গেল। নন্দিনী তার কলেজের সহপাঠিনী, সে যে তাকে মনে করবে,—তাকে দেখতে এ কারায় আসবে, সে কি স্বপ্নেও ভেবেছে ? বলার মত কিছুই বলা হ'ল না, শুধু জিগেস করল,—"আপনি ! আপনি এখানে এলেন !"

নন্দিনী ফিরে চেয়ে তাকে দেখে মৃদু স্নিগ্ধ হাসল, বলল, "আপনাকে ধরেছে শুনলাম, তাই দেখা করতে এলাম, লোক-জনের সঙ্গে দেখা হ'লে আপনার ভাল লাগতে পারে ভেবে—" প্রবালের মালাটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে সে নীরব হয়ে গেল।

নন্দিনীর কথায় পার্থর মনে হ'ল শুধু ভাল লাগবে তার ?—

মাটির বুকে মেঘ যখন গ'লে ঝরে পড়ে,—রিক্ত তপ্ত মাটির সে কি শুধু ভালো লাগা ?

নন্দিনী পুনর্বার বলল, "কেমন আছেন ? খুবই খারাপ লাগে কি ?"

পার্থ সম্বিৎ পেয়ে বলল, "না খুব বেশী খারাপ আর কি ? তবে ভারি একলা লাগছিল"—ভাবলে এই শূন্যতার মাঝ দিয়ে পরিপূর্ণতার আবির্ভাব তার জীবনে।

নন্দিনী বলল, "একলা লাগে, বইটই পড়তে পান না ?"

পার্থ জেলার বাবুর দিকে চাইল। তিনি এতক্ষণ গম্ভীর ভাবে সব শুনছিলেন, বললেন, "হুকুম আনতে হয় প্রথমে, এটা জেলখানা, লাইব্রেরী নয়।"

নন্দিনী বলল, "হাঁচতে কাশতে হুকুম,—কারণ এটা জেলখানা, বিলক্ষণ বোঝা গেছে।"—সে হেসে উঠল ; বুলবুলের শীষের মত সংক্ষিপ্ত মধুর সে হাসি, নিরানন্দ জেলখানার প্রাচীর-ঘেরা অবসাদের ভিতর যেন এক ফোঁটা সূর্য্যরশ্মি। এবার ইচ্ছা-সত্ত্বেও জেলার বাবু আর নিয়মোল্লেখ করতে পারলেন না।

নন্দিনী বলল,—"রোদের আলোরও এখানে আসবার হুকুম নেই বুঝি ? বাইরে এখন শরতের কি মিষ্টি রোদের ছড়াছড়ি, আর আপনাদের এখানটা এত অন্ধকার !"

তার কর্ণভূষার মণির আভাটি গালের যেখানটা রাঙিয়ে রেখেছে সেখানটায় দৃষ্টি রেখে পার্থ বলল, "আপনাদের বাগানের সে শিউলি গাছে ফুল ফুটছে বোধহয় ?"

"ওঃ, ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। এবার যখন আসব, নিয়ে আসব আপনার জন্যে।"

পার্থ বলল, "যা দিয়ে গেলেন এবার এসে,—যে কোনও ফুলের চেয়ে তা মিষ্টি হ'য়ে রইল মনে—" ধীরে সে থেমে গেল।

প্রেমালাপের স্থান জেলখানা নয়—এই নিয়মটা মনে করিয়ে দেবার জন্যে জেলার বাবু ঘন ঘন কেশে উঠলেন। নন্দিনীর গালটা একটু লাল হ'ল, সে কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ঘড়ি দেখে জেলারবাবু বললেন—"সময় উৎরে গেছে।"

সমবেদনা-সুন্দর দুই চোখ তুলে নন্দিনী একবার পার্থের পানে চাইল, তারপর বলল, "পারি যদি ত রবিবার আসব আমি।"

শৃঙ্খলিত দুহাত কপালে ছুঁইয়ে ম্লান হেসে পার্থ বলল, "আসুন"। একটু থেমে নন্দিনী বলল, "যেখানেই থাকবেন, আপনার বন্ধুরা আপনার কথা সব সময় মনে করে, জানবেন।"

পার্থর চোখ দীপ্ত হ'য়ে উঠল। প্রহর বাজল, প্রহরী তাকে নিয়ে চলে গেল।

কারাকক্ষে ফিরে এসে পার্থ প্রথমে খানিক স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল। নন্দিনীর অস্তিত্ব ফুলের সুবাসের মত মনকে তার তখনও জড়িয়ে আছে। তারপর চঞ্চল হ'য়ে সে গেয়ে উঠল,—"গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর"। বাহির হ'তে কড়া সুরে কে ব'লে উঠল, "হাল্লা মাৎ করো।"

নিষেধ সত্ত্বেও পার্থের গান সেদিন উপ্‌চে পড়তে লাগল।

নানা গানের টুকরো ক্ষণে ক্ষণে গুঞ্জন ক'রে অত্যন্ত চঞ্চলতায় কাটল তার দিনটা। রক্ষণ নিযুক্ত প্রহরী একবার উঁকি দিয়ে দেখে আপন মনে বলল, "য্যায়সা সাদিমে যাতা আজ,—বাবু বাউরা ভইল্ ন কা, বা ?"

সেদিন সন্ধ্যায় দূর মন্দিরের ঘণ্টা-ধ্বনি শুনে পার্থের কেবল মনে পড়তে লাগল তার ছেলেবেলার কথা—তার মা, তাদের গৃহ, সন্ধ্যার সেই শঙ্খধ্বনি, তুলসীতলায় সকম্প্র সে দীপশিখা স্নিগ্ধ সকরুণ সে সব দিনের স্মৃতি। এক ঝলক নিস্তেজ আলো শয্যাপ্রান্তে পড়েছে এসে, ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথে মেঘে মাজা একটুকরা আকাশ দেখা যায়,—দু একটা পায়রা সেখানে ডানা ছড়িয়ে ভাসছে,—গতির ছন্দে উচ্ছল তাদের দেহ। পার্থর মনে পড়ল মুক্তির আনন্দ। রাত্রেও সে বারবার জেগে উঠল,—নয়ন-ভুলান' এল যে তার! তার অন্তরের সকল ধারা যে সুন্দরের সন্ধানে ছুটেছে এতদিন, আপন হ'তে সে সুন্দর মূর্ত্তি নিয়ে এল আজ। তার অতল কালো দুই চোখে, ক্ষীণ কঙ্কণ জড়ানো ললিত নিখুঁত দুই হাতে, তনুদেহের দাঁড়াবার ভঙ্গীতে—লীলার ঝরণা ঝরেছে ;—তার বসন পরার ধরণে, বিপুল কবরীর বন্ধনে কী মায়া রচেছে সে—পার্থ যেন নিজের জীবনটাকে একটা গানের মত বেঁধে তার নিরুপম চরণে নুপুর ক'রে জড়িয়ে দিতে চায়!

রবিবার এল ; শরতের খেয়ালি মেঘে বর্ষার মত বাদল লেগেছে সেদিন ; বিবর্ণ আকাশের পানে ব্যথিত চোখে চেয়ে

চুপ ক'রে বসেছিল পার্থ। প্রহরী তার অভুক্ত আহার্য্য ফিরিয়ে নিয়ে গেল। কতবার পার্থ জিগ্‌গেস করল, কেউ এল কিনা, কোনও উত্তর পেল না।

রাত্রে জেলারবাবু প্রাত্যহিক পরিদর্শনের সময় পার্থর ঘরে যেয়ে তাকে নীলাভ ধূসর একটা খাম দিলেন। খামখানা গ্রহণ করতে পার্থর সবল হাতটা অধীরতায় কেঁপে গেল—দ্বিধাভরে জিগ্‌গেস করল, "কেউ এসেছিল কি?"

জেলারবাবু উত্তর না দিয়ে একটু হেসে চলে গেলেন। আগ্রহে ব্যাকুল হ'য়ে খামটা খুলে পার্থ দেখলে নেতিয়ে পড়া শেফালির একগাছি মালা গন্ধে আকুল হ'য়ে আছে।...

ভোর না হ'তেই দয়াল পার্থর ঘরের সামনে চটি টানতে টানতে এসে বললেন—"পার্থ উঠেছ? আজ তোমাকে থানায় যেতে হবে।"

একটু পরেই সুরভি বললেন, "উঠলে বাবা, আজ যে তোমার থানায় যাবার দিন।"

প্রভাত হওয়া মাত্র তাড়নার আরম্ভ দেখে পার্থ তিক্ত চিত্তে উঠে বসল। থানা পুলিস আর দারোগা কাকার উল্লেখের আভাসেই সে সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠত আজকাল, জানত এখনি খানিকটা অসন্তোষের সৃষ্টি হবে।

বারান্দার একধারে ব'সে দয়াল চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন, পার্থ বেরিয়ে এলে ছেলেকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—"চুলগুলো ত রুক্ষ

কাগের বাসা ক'রে রেখেছ, ঐ বুঝি আজকালকার ফ্যাশান—দারোগা-টারোগার সঙ্গে কথা কইতে হবে, চটের মত কাপড়খানা না হয় বদলালেই আজ। আর দেখ বাপু, দারোগাবাবুর সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। তোমার জন্যে যেন চটাচটি না হয়, বলে দিচ্ছি। একটু নরম হ'য়ে থেক।" তিনি গজ্‌গজ করতে করতে বাইরে চ'লে গেলেন।

পার্থকে চা এনে দিয়ে সুরভি বললেন, "দেখত বাবা চিনি ঠিক হয়েছে কি না। কাল তুমি কোথায় গেছলে পার্থ, দেরী দেখে আমরা ভয়ে মরি; তোমাকে খুঁজতে লোক পাঠাব, না তোমার দারোগা কাকার কাছে যেয়ে বলা হবে, কিছুই আর ভেবে পাই না।"

পার্থ অধীর হ'য়ে বলল, "আমার কি নড়া-চড়াও বারণ মা? প্রতিপদে থানা আর দারোগা,—আমায় দেখছি পাগল ক'রে ছাড়বে।"

"কিন্তু বাবা, তোমার বাবাকে যে জবাবদিহি করতে হবে, তিনি যে তোমার জন্যে দায়ী। এসব কি যে তোমার মাথায় ঢুকেছিল! কবে যে ঠাকুর তোমায় সুমতি দেবেন তা তিনিই জানেন।"—সুরভি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

পার্থ বিরক্ত হ'য়ে বলল, "আমার মতিগতি বদলাবার নয় মা; তা নিয়ে দুঃখ ক'রে আর কি হবে।"

সুরভি বললেন, "সাব্‌রেজিষ্ট্রার বাবুর ছেলে,—সেই যে তোমার সঙ্গে পড়ত—কলকাতায় কোন্ আপিসে চাকরী পেয়েছে,

পঁচিশ টাকা মাইনে, উপ্‌রিও আছে। ছুটিতে বাড়ী এসেছে। তুমি এসেছ শুনে দেখা করতে এসেছিল কাল। কেমন দিব্যি বউটি তার! তিনটি ছেলেও হয়েছে এরি মধ্যে! তোমারই এমন দশা এখনও! বউয়ের মুখ দেখা কি আর আমার কপালে আছে!”—সনিঃশ্বাসে তিনি চুপ করলেন।

পার্থ হেসে বললে, “কে আমায় বিয়ে করবে মা? আমার ত পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরী নেই, উপ্‌রি ত দূরের কথা!”

সুরভি বললেন, “ওমা, শোন ছেলের কথা! বাংলা দেশে আবার মেয়ের অভাব! এই ত দারোগা বাবুরই কেমন একটি ডাগর মেয়ে রয়েছে—লেখা-পড়া, কুরুস্‌বোনা সব জানে। তা তুমি রাজী হ'লে ত বাছা!”

তিনি একটু মুখ ভার ক'রে রইলেন।

পার্থ উঠে পড়ে বলল, “থানায় চল্‌লাম মা; আপাততঃ দারোগাবাবুর সঙ্গে শ্বশুর জামাই সম্পর্ক ত নেই,—দেরী হ'লে হাঙ্গাম হতে পারে।”

সুরভি তার সঙ্গে অঙ্গনের দুয়ার পর্য্যন্ত এসে বললেন,—“ভালয় ভালয় ফিরে এসো বাবা, দুর্গা দুর্গা—” থানায় যাওয়াটা প্রায় যুদ্ধে যাবার মতই বিরাট ব্যাপার তাঁর কাছে।

থানায় যেয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর দারোগাবাবুর ডাক এল। ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে ঘর, দেয়ালের কোণে কোণে লূতাতন্তু নির্ব্বন্ধে ঘন হ'য়ে চলেছে; একা বসে বসে বাপের

উপদেশ, মায়ের নিঃশ্বাস মনে পড়ে পার্থ অবসাদে ক্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

একরাশ কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে দারোগাবাবু লিখে যাচ্ছিলেন, মুখ না তুলে পার্থকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। দারোগা বাবুর প্রশ্নোত্তর পার্থ যথারীতি শেষ করল। দারোগা বাবু বললেন, "তারপর, এখন কি করা হচ্ছে? তোমার বাবা আমার অনেক দিনের বন্ধু জান ত?" পার্থর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে বললেন, "ওটা ইঁদুর কল, না পাতলে রক্ষে আছে, এই সেদিন একটা দরকারি কাগজ ইঁদুরে খেয়ে একদম শেষ করেছে!"

পার্থ একটু হেসে বললে, "এখানকার কাগজপত্তর পর্য্যন্ত খুব সরস দেখছি, ইঁদুরে খেয়ে ফেলে!"

দারোগাবাবু চোখ তুলে তাকে দেখে বললেন—"কি বললে? হুঁ—তা তোমার মাথা এখন ঠাণ্ডা হয়েছে ত? স্বরাজ স্বরাজ ক'রে জেলে যেয়ে লাভটা কি হবে বোঝাও দিকি বাপু!"

পার্থর বোঝাবার কোনও চেষ্টা দেখা গেল না। দারোগাবাবু চোখ বুলিয়ে একবার চারিদিক দেখে নিয়ে বললেন, "ওসব হুজুগ্-ফুজুগ ছেড়ে দাও, বুঝলে? তুমি দয়ালের ছেলে, তাই আমার বলা। স্বাধীনতা! আরে বাপু, আমাদের সময় আমরাও ওসব ঢের ক'রেছি—দিশী চিনি খেয়েছি, স্বদেশী নেতার গাড়ী টেনেছি, ফের যখন জ্ঞানবুদ্ধি হ'ল তখন সমস্ত শুধরে নিতেও পেরেছি। এই নেতাদের কথায় আর নাচানাচি ক'র না।

তাদের কথায় নেচে তোমরা গরীব বেচারীরা মার খেয়ে মর, জেলে গিয়ে ঘানি টানো, আর নেতারা ততক্ষণ মোটরে চড়ে ফুলের মালা গলায় দিয়ে বক্তৃতা ক'রে বেড়ান। দু'একজনের জেলও হয়—তবে সে জেল আর তোমাদের জেল ঢের তফাৎ ;—তাঁরা থাকেন রাজার হালে, ইলেকট্রিক লাইট্ ফ্যান্, মাসে মাসে হাজার টাকা ক'রে পেন্সন,—জান ত সবই! আবার শরীর খারাপ হলে দার্জ্জিলিং, সুইজারল্যাণ্ড! বেশ ক'রে বুঝে দেখ। তুমি যা করবার তা ত ক'রে ফেলেছ, এখন ওসব বোকামি না ক'রে যাতে একটা চাকরী-বাকরি জোটে সেই চেষ্টা ক'রে দেখ। বুড়ো বাপ মা, তাঁরা তোমার মুখ চেয়েই ত রয়েছেন। ওসব বাজে কাজে হৈ হৈ ক'রে বেড়ালেই ত আর পেট ভরবে না। কচি খোকাটিও নও, গোঁফ্ দাড়ী গজিয়েছে, এতদিনে বুদ্ধি-সুদ্ধি হওয়া উচিত।"

বক্তৃতার শ্রোতে পার্থ হাঁপিয়ে উঠল। উঠে পড়ে বলল, "মাপ করবেন, আপনার দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, আমি আসি।"—একটা নমস্কার ক'রে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

দারোগাবাবু ভ্রূকুটি ক'রে চেয়ে পুনর্ব্বার কাগজে মন দিলেন।......

নির্মেঘ আকাশের হাসি আলোর ধারায় ছড়িয়ে গেছে, নরম ঘাসে শিশিরের চুম্বন চুমকি হ'য়ে জ্বলছে ; মালতী লতার সারা দেহে ফুল ফোটাবার ব্যাকুলতা—ময়ূরকণ্ঠী রঙের ছোটো মধুচুষকি পাখীর মধু আহরণের কি ব্যস্ততা!—পার্থ ঘর ছেড়ে

বেরিয়ে পড়ল দীঘির ধারে যেখানে বিরল বেণুবনে উত্তরে হাওয়ার মর্মরাণি জেগেছে। তটের পরে দীর্ঘ ঘন শরঘাস শীতের বাতাসে নত হ'য়ে পড়ছে; হেলান' দেহ বাবলার শাখা হ'তে হলদে ফুল সোণার কৌটায় চুঁয়ে পড়ছে জলে; হেলা ফুলের পত্রলতায় পা ফেলে ফেলে ডাহুক হেলার বন্ধ কুঁড়িকে ঠুকরে ফিরছে; চারিধারের তন্দ্রালস নীরবতা ডাহুকের আচম্‌কা ডাকে ব্যথিয়ে উঠছে থেকে থেকে। পার্থ এই নিরালায় বসে শোনে প্রকৃতির মনের গোপন কথাটি আকাশে আলোর বীণায় বাজ্‌ছে—মৃদু হাওয়ায় গুঞ্জিত হ'চ্ছে নিত্য। ঘরে থাকলে সেই অফুরন্ত অনুযোগ অনুক্ষণ,—পার্থ বাপ মার কোনও কাজে লাগল না, কোনও আশা পূর্ণও করল না, সকলে কেমন ঘর-করণা করছে, পার্থর দ্বারা কোনও সাধ মিটল না। সুরভি নিঃশ্বাস ফেলে নীরব থাকেন, দয়াল অদৃষ্টকে দোষ দেন। পার্থকে পড়তে দেখলে, দয়াল হাত উলটে বলেন, "পড়াশোনা ক'রে তো সবই হ'ল,—হুঁঃ।" একপয়সা ত সে আজও ঘরে আনতে পারল না! পার্থর গান শুনলে বলেন,—"ওই হ'চ্ছে কেবল, আর আমি এই বয়সে গাধার খাটুনি খেটে মরছি!" পার্থর সব কাজই তাঁর চোখে অন্যায় হ'য়ে লাগে। পুত্রের প্রতি অজস্র স্নেহ ধারণার ভুলে উগ্রতায় পরিবর্তিত হ'য়ে প্রকাশ পায়,—ভ্রান্ত সন্তানকে সুপথে আনতে এই সব শ্লেষের বাণই অব্যর্থ ব'লে তাঁর বিশ্বাস। পার্থর থানায় সেদিনের ব্যবহার শুনে তিনি আরও উঠে পড়ে লাগলেন তার চৈতন্য বিধান করতে।

সেদিন দারোগাবাবুর সঙ্গে বাজারে দয়ালের দেখা হ'ল, দারোগা বললেন, "কই হে, তোমার ছেলের চুলের টিকিটিও ত দেখা যায় না,—চুপি চুপি ব'সে সে বোমাটোমা তৈরী করছে না ত?"

কুণ্ঠায় দয়ালের প্রায় মাথা কাটা গেল—ছেলেটাকে তিনি অন্ততঃ হাজারবার বলেছেন দারোগার বাড়ী যেতে; ভদ্রলোকের কাছে তাঁকে অপ্রস্তুত না ক'রে ছাড়বে না সে। সত্যিই তার কাজটা কি?—মাঝে মাঝে গেলেই ত পারে—দারোগাবাবুকে সন্তুষ্ট রাখা ত সবদিকেই সুবিধের। দয়াল মাথা চুলকে বললেন, "তার মা'র শরীরটা তেমন ভাল নেই কি না, কোথাও তাই যেয়ে উঠতে পারে না।" ছেলের হ'য়ে আরও একটু ওকালতী করলেন, "আর ভায়া, একটা অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছে, তোমাদের কাছে যেয়ে দাঁড়াতে একটু লজ্জাও ত হয়।"

দারোগাবাবু প্রশান্ত হাসি হেসে বললেন, "আরে সে যা হবার হ'য়ে গেছে, তার ত আর চারা নেই। তাকে আসতে বলো দেখি কোনও হিল্লে ক'রে দিতে পারি কি না।"

দয়াল কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হ'য়ে উঠলেন।—দারোগা বাবু যেন মাটীর মানুষ। এমন কথা কোন্ দারোগায় বলে বল দেখি! তাঁর ছেলে নেহাৎই বোকা, তা না হ'লে এঁকে দিয়ে কত কাজ বাগিয়ে নিতে পারত। খুসীর আতিশয্যে তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত একগাদা বাজার ক'রে ফেল্‌লেন। সুরভি

সেদিন দয়ালের প্রসন্নতা দেখে বিস্মিত হ'য়ে গেলেন, দয়ালের মেজাজ ঠাণ্ডা দেখে সুরভির মনও হাল্‌কা হ'য়ে উঠল।

মধ্যাহ্নে খেতে ব'সে দয়াল রহস্য ক'রে বললেন, "গিন্নী তুমিও নুন তৈরীর দলে যোগ দিয়েছ না কি?—ডালে যে কেবল নুন!" পার্থকে বললেন, "দারোগা বাবু আজ বললেন —ওকি থামলে কেন, খাও, এ তোমার দিশী নুন, খেলে জাত যাবে না।" ব'লে খানিকটা হাসলেন।

পার্থ নীরব রইল।

দয়াল বললেন, "দারোগা বাবু কত দুঃখু করছিলেন, তোমায় এতবার বলি, একবার যেতে পারলে না তাঁর বাড়ী। আজ যেও দিকি একবার।" পুরাতন কালো পোষাকের ওপর মলিন চাদরখানা জড়িয়ে স্কুলে যেতে যেতে তিনি স্থির করলেন ছেলে. না গেলে তিনিই না হয় আজ একবার দারোগার ওখানে হ'য়ে আসবেন।

বিকেলে কর্ম হ'তে ফিরে এসে দয়াল ডাকছিলেন,—"গিন্নী, শুনে যাও, তোমার ছেলের বিয়ের যে সম্বন্ধ এসেছে,—কি খাওয়াবে আমায় বল দিকি?"

সুরভি বেরিয়ে এসে বললেন, "সে কি গো? কোথা থেকে?" একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "এমন দিন কি ঠাকুর দেবেন?" বিয়ের সম্বন্ধ এলেই যে পার্থ সম্মত হবে,—সে বিষয়ে দয়াল নিশ্চিন্ত থাকলেও সুরভির মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

দয়াল ডাকলেন, "পার্থ শুনে যাও! দেখ, একেই বলে

কপাল, গিন্নী, দারোগাবাবু নিজে থেকে তাঁর মেয়ের সঙ্গে পার্থর বিয়ের কথা তুললেন, এমন মানুষ কি হয়। পার্থর একটা চাকরীও সুপারিশ করিয়ে দেবেন,—কত বড় বড় সায়েবের সঙ্গে, হাকিমদের সঙ্গে জানাশোনা, সহজ কথা ত নয়!"

পার্থ বই রেখে উঠে এসেছিল, তার দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি এখন এই কাগজটায় একটা সই ক'রে দিলেই হয়; একটা কেরাণীর কাজ কোথায় খালিও আছে, দারোগা বাবু চেষ্টা ক'রে তোমায় সেখানে ঢুকিয়ে দেবেন।"

দয়াল যতক্ষণ সুরভিকে ওপরওয়ালাদের কাছে দারোগাবাবুর অসাধারণ প্রতিপত্তির কথা বিশদভাবে বর্ণনা করছিলেন, ততক্ষণে পার্থ কাগজখানার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। কৃতকর্ম্মের জন্য নানা অনুতাপের পর এবার হ'তে সকল রকমে প্রথমভাগের গোপালের মত সুশীল সুবোধ হবার স্বীকারপত্র,—পার্থ দেখে নিয়ে কাগজ নামিয়ে রাখল।

পার্থর মুখ দেখে এতক্ষণে দয়ালের একটু খেয়াল হ'ল,—তিনি কিছু স্থির হ'য়ে বললেন, "দেখলে ত? দারোগা বাবুও ওতে তোমার হ'য়ে লিখে দেবেন। তারপর শুভকাজটি হ'য়ে গেলেই তোমায় চাকরীতে ঢুকিয়ে দেবেন। তুমি এখন সইটা ক'রে দাও।"

পার্থ শান্তভাবে বলল, "ওতে আমি সই করতে পারব না বাবা। তোমরা আমার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হ'য়ো না, চাকরীর লোভে বিয়ে করাটা এমন কিছু গৌরবের নয়।"

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে দয়াল সক্রোধে বললেন,—"আর ব'সে ব'সে বাপের অন্নধ্বংস করাটা ভারী গৌরবের, না? বলতে লজ্জা হয় না? আমি হ'লে গলায় দড়ি দিতাম!"

পার্থর তপ্ত মুখ আগুন বরণ হ'য়ে উঠল, কী সে বলতে যাচ্ছিল, সুরভি মিনতির সুরে বললেন,—"চুপ কর পার্থ।" দয়ালকে বললেন, "থাম তুমি! রাগলে আর কোন কথা মুখে আটকায় না, না?"

দয়াল গর্জাতে লাগলেন, "দারোগাবাবু নিজে থেকে যেচে বিয়ের প্রস্তাব আনলেন, সে বিয়ে লাটসায়েব উনি করবেন না! ভারী লায়েক হ'য়েছেন কিনা! অতবড় মুরুব্বি, অমন চাকরী,— সে সব ওঁর মনঃপুত নয়! গুণের জাহাজ একেবারে! বিয়ে করবে না ত করবে কি শুনি?"

"ওখানে বিয়ে করা অসম্ভব আমার—" ওষ্ঠে ওষ্ঠ চেপে পার্থ বেরিয়ে গেল বাইরে, পাছে উদ্যত ক্রোধটা সামলাতে না পারে। নদীর ধারে এসে সিক্ত ঘাসে সে বসে পড়ল। শীতের সকরুণ সন্ধ্যা ধীরে নেমে আসছে, দীপ্ত মণিপুঞ্জের মত রক্তসূর্য্য আকাশে জলে রঙ ঢেলে নদীর বাঁকে লুকিয়ে গেল; রাত্রের অভিসার অপেক্ষায় নির্জ্জন নদীতীর থমকে রইল। দূরের পানে দৃষ্টি মেলে পার্থ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল—মন তার কোন্ অজানায় ভেসে গেছে সেই কি তা জানে?—কতদূরে কোন্‌খানে, কোন্ দেশের পানে,—যেখানে থাকে তার মানসী—সেই যেখানে নির্জ্জন বাগানে নিবিড় তরুবীথির বুকে রক্তধারার মত রাঙা পথ, গৃহের

গা জড়িয়ে গোলাপলতা উঠেছে, শেফালির ফুলে ছাওয়া মূলে বেত্রাসন রাখা রয়েছে ;—কক্ষে দীপের স্নিগ্ধ আলোয় পাঠরতা এক তরুণী—সন্ধ্যাবায়ে নীলবাস তার উড়ে উড়ে পড়ছে, কালো চুলে রক্তমণির মত এক গোলাপ জ্বলছে, কালো হ'য়ে আসা এই নদীজলের মত গভীর কালো দুই চোখে কিসের আলো ঝলসে উঠছে। পার্থর মনে পড়ল কোন্ স্বপ্নে শোনা সে বাণী, —'আপনার বন্ধুরা আপনার কথা ভাবে'—ধ্যানধূসর এই সন্ধ্যায় সন্ধ্যাতারার দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিয়ে সে কি ভাবে কখন' এক ভাগ্য-হীন যুবার কথা? পার্থর ওষ্ঠ ব্যথায় কেঁপে উঠল, অতি করুণ সুরে ধীরে সে গান ধরল—

"তুমি উষার সোনার বিন্দু প্রাণের সিন্ধু কূলে
শরৎপ্রাতের প্রথম শিশির প্রথম শিউলি ফুলে।
ইন্দ্রলোকের ইন্দ্রধনু ধরার পরে নোওয়া—
নন্দনেরি নন্দিনী গো চন্দ্রলেখায় চোঁয়া—
প্রতিপদের চন্দ্রে স্বপন, ধরায় এলে ভুলে——"

তালবনের আড়াল দিয়ে চাঁদ উঠল, আঁধার নদী আলোয় গলে সাদা হ'য়ে গেল, পার্থর গান জ্যোৎস্নায় সিক্ত হ'য়ে স্নিগ্ধ হ'য়ে এল—

"তুমি কবির খেয়ান ছবি পূর্ব্বজনম স্মৃতি
তুমি আমার কুড়িয়ে পাওয়া হারিয়ে যাওয়া গীতি"—

চূর্ণরজতের মত শুভ্রসিকতায় সে সুর গড়িয়ে যেয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে নদীর তটে লোটাতে লাগল, আকাশে জ্যোৎস্না-ধারার তারে

বেজে উঠল, মৃদু হাওয়ায় মিশে যেয়ে স্বচ্ছ মেঘের গা ঘেঁসে কোন্ বাতায়ন-বর্ত্তিনীর উদ্দেশে ভেসে চলল—

"যে কথাটি যায় না বলা, কইলে চুপে চুপে
তুমি আমার মুক্তি হ'য়ে এলে বাঁধন রূপে—"

কবি তার মনের গোপন কথাটি কেমন ক'রে জানলেন, কেমন ক'রে তাকে রূপ দিলেন! যা সে ভেবেছে কত গহন অন্ধকারের রাতে, নিভৃতে,—যে নীরব গান বেজেছে তার মনের বীণার তারে কত সঘনগগনের অবিরাম অশ্রুবর্ষণের মাঝে, তাকে কবি কোন্ মায়াবলে এ অপরূপ রূপ দিলেন! পার্থ তন্ময় হ'য়ে গাইতে লাগল।...

"এই যে, হেঁ হেঁ, গান হ'চ্ছে বুঝি, হেঁ হেঁ—" ডাক্তার বাবু বকের মত পা ফেলে সামনে এসে দাঁড়ালেন। আকাশে. আলোয় বাতাসে জলে মিলিয়ে এক অশরীরী ঐন্দ্রজালিকের মায়ার বীণার সুরে যে স্বপ্নরাজ্য এতক্ষণ গড়ে উঠেছিল হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে তা চুরমার হয়ে ভেঙে গেল। ভয়ানক চম্‌কে পার্থ চুপ করল।

"থামলে কেন, গাওনা, দাশুরায়ের গান ত ওটা, ওসব আমিও একটু আধটু বুঝি, হেঁ হেঁ। ছেলেবেলায় সখের থিয়েটারে আমাকে সখী সাজিয়ে গান করাতে কতবার ধরে নিয়ে যেত।" ডাক্তার বাবু পার্থের পাশে বাগিয়ে ব'সে বললেন,—"তারপর সব খবর কি? দারোগা বাবুর সঙ্গে দেখা করতে থানায় গেছলে ত? তা তিনি কি বললেন?"

পার্থ ছিট্‌কে উঠে পড়ল,—"দূর হোক্ গে যাক্ আপনাদের থানা আর দারোগা বাবু! আপনাদের সকলের কি আমার জন্যে রাত্রে সুনিদ্রা নেই!"—ক্ষিপ্র গতিতে সে গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

এরকম ব্যবহারে বেজায় থতমত খেয়ে ডাক্তার বাবু বললেন, "এঁ্যা"—একটু বিমূঢ় হ'য়ে থেকে বললেন,—"ভাল বললে মন্দ হয়, হুঃ।"—আস্তে আস্তে তিনি বাড়ী ফিরে চললেন।

অনেক রাতে পার্থ যখন বাড়ী এল, সুরভি দীপ জ্বালিয়ে জেগে বসে ছিলেন। পার্থ অবসন্ন দেহে শয্যায় শুয়ে পড়ল যেয়ে। সুরভি এসে শিয়রে বসলেন। মাতাপুত্রে বহুক্ষণ নীরব। পার্থ বলল,—"এখানে আমি থাকতে পারি না, আমায় যেতে হচ্ছে মা।"

সুরভি ব্যাকুল হ'য়ে বললেন,—"তুমি চলে যাবে, কোথায় যাবে বাবা? আর তোমার বাবা যে জামিন হ'য়েছেন, তুমি এখান থেকে চলে গেলে যে তাঁকে ধরবে!"

বেতের আঘাতের মত এই সত্যটা পুনর্ব্বার পার্থ উপলব্ধি করল—কাঁটার বাঁধনে আবদ্ধ সে, যেদিকে নড়বে, কণ্টকে দীর্ণ হ'বে। তপ্ত ললাটটা উপাধানে চেপে সে পড়ে রইল।

সুরভি অনুনয় কাতর কণ্ঠে বললেন, "এ সব ছেড়ে দাও বাবা, তোমার বাপ যা বলেন শোন, তোমারই তাতে ভাল হবে পার্থ।" একটু থেমে বললেন, "মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল, সব ধারেই সুবিধে হয়, কেন অমত করছ বাবা।"

পার্থ ধীরে বলল, "সে হয় না মা, আমায় অনর্থক অনুরোধ ক'রো না।"

"কেন হ'বে না পার্থ? দারোগা বাবু নিজে বলেছেন, তাঁর কথা না রাখলে তাঁর অপমান হবে। তাঁকে চটিয়ে আমরা এখানে টিঁকতে পারব কি?—কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ক'রে জলে বাস করা চলেনা বাবা!"

পার্থ একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেল। আবার কাঁটার বাঁধন!

সুরভি বললেন,—"বুঝতে ত পার সব, কাল দারোগা বাবু আসবেন, তাঁকে কি 'না' বলে ফেরান যায়? এই সব ভেবে দেখ বাবা, উপায় ত নেই।"

পার্থ রুদ্ধ স্বরে বলল, "না মা, কোনও উপায় নেই, মরা ছাড়া দেখছি আমার মুক্তি নেই।"

সুরভি ব'লে উঠলেন, "বালাই, ও কি কথা!" তাঁরও স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। দুজনেই নীরব। পুত্রের বেদনায় মাতার সমবেদনা অশ্রু হ'য়ে ঝরতে লাগল পার্থর কেশের পরে।

কতক্ষণ পরে পার্থকে নিদ্রিত ভেবে সুরভি নিঃশব্দে উঠে গেলেন। খানিকক্ষণ বিছানায় পড়ে থেকে পার্থ উঠে এসে জানালাটা খুলে দিলে, বাহিরের শিশির-ভরা হাওয়ার পরশে তার জ্বালাধরা মাথাটা একটু স্নিগ্ধ হ'ল। চাঁদ অস্ত গেছে বড় বড় কয়েকটা তারা আঁধার আকাশে দপ্‌দপ্ করছে; নীচের জগৎ যখন রাত্রির অবগুণ্ঠনে নিজেকে অপরিচয়ে রাখতে চায়—ওপর হ'তে ওই কটা তারা কোন্ অজানার আলো দেখায়,

কোন্ অচেনা পথের প্রদীপ হ'য়ে জ্বলে, কোন্ বন্ধুর কল্যাণ দৃষ্টির মত! সে বন্ধু কি সত্যিই তার কথা ভাবে?—পার্থ অনিমেষে তাকিয়ে থেকে অবশেষে শয্যায় ফিরে এল। তার মা আফিমের পাত্রটা বিছানায় ফেলে গেছেন, স্থির দৃষ্টিতে পার্থ সেটার দিকে তাকিয়ে রইল, কি ভেবে হঠাৎ সেটাকে তুলে নিল হাতে। সুন্দরের মাঝে অসুন্দর যখন জাগে, ছন্দ তার নির্ম্মম হ'য়ে বাজে জীবনে; নিষ্ঠুর তার প্রকাশ,—নিদারুণ তার জয়। আলোহীন রাত, অন্ধকার চারিধার, অন্ধকার পার্থর জীবন। তারার বাণীতে যে অজানা আলোর আহ্বান জ্বলছে, সে কী সাড়া দেবে না তাতে? আজ তার বাঁধন ছেঁড়ার সাধন—বাইরের আকাশে ওই যে তারা জ্বলছে, কাল সমুদ্রে আলোর যাত্রী, ওর বাতায়ন দিয়ে এল সেই তরঙ্গের ডাক,—বক্ষের পরতে পরতে বেজে উঠল তার বজ্রভেরী,—সে কী সাড়া দেবে না তাতে! পার্থর দুই চোখ ঝল্‌সে উঠল, ওষ্ঠের পরে ওষ্ঠ কঠিন ক'রে সংবদ্ধ করল, শিথিল মুষ্টি তার শক্ত হ'য়ে পাত্রটাকে চেপে ধরল, সে মুষ্টির শিরা উপশিরা এক অতিচঞ্চল রক্তস্রোতে স্ফীত হ'য়ে উঠল। · ···

পরদিন প্রভাতে দয়ালের গৃহে পাড়াপ্রতিবেশীর ভিড় জমে উঠল। দারোগাবাবু এলেন, বললেন, "তাইত, ছেলেটা এমন মাথাপাগলা ছিল হে।" ডাক্তারবাবু এলেন, বললেন, "তা আর বলতে, কাল রাতে ওর রকম সকম দেখেই আমি বুঝে নিয়েছি। আমরা হ'লাম ডাক্তার, আমাদের কাছে শরীর আর

মনের অবস্থা লুকিয়ে রাখা কি সোজা কথা, হেঁ হেঁ।” দয়াল পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগলেন।

পার্থর ঘরে সুরভি পাথরের মত নিস্পন্দ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ছিলেন। পার্থর বুকের কাছ হ'তে একটা বিশুষ্ক শেফালির মালার ক্ষীণ সুগন্ধ নিঃশব্দ সান্ত্বনার মত ঘরময় ভেসে বেড়াতে লাগল।

সুরভি অতি ধীরে শুষ্ক শেফালির মালাটি পার্থর মৃত্যুমলিন কণ্ঠে জড়িয়ে দিয়ে তার কপালে একটি ক্ষুদ্র চুম্বন রেখে বললেন, “আজ তোর মুক্তি হ'ল।”

তাঁর চোখে অশ্রু ছিল না।

লিপি-পঞ্চক

১

বৈদিক যুগ

"আমি তোমাকে বার্ত্তাবহ নির্ব্বাচন করলাম,—জ্ঞানসম্পন্ন ভায়মান্—তুমি অশ্বিনীনন্দনের প্রজাপতি-প্রদত্ত রাসভবাহিত রথের ন্যায় দ্রুতগামী; আশ্রম ঋষিমণ্ডলী তোমার গুণাবলী পরিদর্শনে তোমাকেই দূতরূপে নিযুক্ত করেন!

"এই কুশ-তৃণনির্ম্মিত আসন পরে উপবেশন ক'রে মৎপ্রদত্ত মধুর সোমরস পান কর; আশীর্ব্বাদ-পূত এই সোমরস পানপূর্ব্বক, ভায়মান্, তুমি পরিতৃপ্ত হও।

"অতঃপর মত্তার্য্যা শশ্বতী সন্নিধানে তুমি গমন ক'রে আমার এই নবরচিত বাণী মধুর ছন্দে তাঁহার শ্রবণগোচর করাও।

"উগ্রদেব তোমায় সম্বোধন ক'রে,—অনিন্দিতা শশ্বতী,—তার স্থিরীকৃতচিত্তবিন্যাসিতা বাণী, যাহা ধাবমানা স্রোতস্বিনীর ন্যায় স্বতঃনিসৃত, তাহাই ব্যক্ত করছে।"

"রজনীর মালিন্য মোচন ক'রে হেথায় জ্যোতির্ভূষণা উষার আবির্ভাব হয়েছে! ক্ষৌরকার যে ভাবে কেশকর্ত্তন করে, শুভ্রা উষা এখন সেইরূপ পুঞ্জীভূত অন্ধকারকে ছেদন করছেন; গো-মাতা যে ভাবে দোগ্ধাকে দুগ্ধ দান করেন, আলোকোজ্জ্বলা উষা

তদ্রূপ মুক্ত বক্ষ হ'তে আমাদের আলোক বিতরণ করছেন। আমরা তমোরাজ্য পার হ'য়ে এসেছি, স্বর্গসুতা আমাদের আনন্দবিধানের জন্য অন্ধকারকে গ্রাস করেছেন।

"উজ্জ্বলা ঊষা সূর্য্যরশ্মিবিভূষিতা হ'য়ে এক্ষণে জরাঘোষার মত প্রতিভাত হয়েছেন; শশ্বতী,—ঊষা যেরূপে সূর্য্য আগমনে সূর্য্যদেহে মিলিত হয়েছেন, আমার প্রত্যাগমনে, শুচিস্মিতে, আমার দেহে তুমি ঐরূপ লীনা হ'য়ো। গৌতমবন্দিতা ঊষাকে আমি প্রণাম করি,—তিনি তোমার ব্রত উদ্‌যাপনের সহায় হোন, তোমার গেহ ধান্যধনে পূর্ণ করুন।

"দীপ্তিমান্ সূর্য্য আকাশে ভাস্বর হ'য়ে উঠেছেন এবার, তাঁর তেজোময় শুভচিহ্নিত প্রশংসনীয় অশ্বসকল আকাশমার্গে দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়েছে; সূর্য্যের ঔজ্জ্বল্যকে আমি বরণ করি, সূর্য্যোদয়ের সাথে,—নিষ্পাপা—আজকের দিবস তোমার মঙ্গলময় হোক, দেবগণ তোমায় অশুভ হ'তে ত্রাণ করুন।

"অনন্তর উগ্রদেব স্বর্গমর্ত্তকে বন্দনা করছে, তোমরা শশ্বতীর মঙ্গল কর।

"আমি অগ্নিকে ঘৃতাহুতি প্রদানপূর্ব্বক বন্দনা করি, যিনি দীপ্তিমান, অসীম তেজোময়, সত্যকে যিনি নিত্য আলোকিত করেন, যজ্ঞক্ষেত্রে যিনি দেবগণের হব্যবাহী, যাঁর রক্তবর্ণ অশ্ব-সমন্বিত রথ বৃষভসম গর্জ্জনপূর্ব্বক অরণ্য ধূমধ্বজে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়, সেই শুদ্ধ বৈশ্বানর যেন তোমার প্রতি তুষ্ট থাকেন,—পুণ্যচরিতা,—তোমায় যেন সৌভাগ্য দান করেন; পিতার নৈকট্য পুত্রের

যেমন সহজলভ্য, পবিত্র পাবক যেন সেইরূপ তোমার সহজলভ্য হন, তোমায় রক্ষা করেন।

"উগ্রদেব শ্রদ্ধাসহ ইন্দ্রকে সোমরস নিবেদনান্তে স্তবগান করছে; তিনি বৃত্রকে যেভাবে বধ করেছিলেন সেইভাবে শশ্বতীর তপোবনের অহিসকল বিনাশ করুন। সুজাতা শশ্বতী,— মহাশক্তি মেঘবাহন তোমার প্রতি প্রসন্ন হোন্।

"অশ্বিনীকুমারদিগকে আমি বন্দনা করি, যন্ত্রণাত্রাতা দেবতা-দ্বয় তোমায় চিরযৌবনা রাখুন; তাঁরা যেরূপে ঘোষা, চ্যবন প্রভৃতি ভক্তগণকে বরদান করেছিলেন, শুভে,. তোমাকেও সেইরূপে বরদানে ধন্য করুন।

"অগ্নি ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও বিশ্বদেব সকল, আমার হৃদি-বন্দিতা শশ্বতীকে যেন আনন্দের পথে নিত্য পরিচালিত করেন, বায়ু যেন তোমার সুফল আনয়ন করে, নদী যেন তোমার মধুর বারি বহন করে, বনস্পতি যেন তোমায় মধুময় ফল প্রদান করে, তোমার নিশা, তোমার উষা মধুর হোক্; তোমার জগৎ,— কল্যাণভাষিণী শশ্বতী, মধুময় হোক্। সূর্য্য তোমার প্রতি মাধুর্য্যময় হোন্, রক্ষণকারী স্বর্গ আমাদের প্রতি মধুবর্ষণ করুক।

"প্রশংসনীয় ভায়মান,—বায়ুর মত লঘুগতিতে নিজেকে সঞ্চারিত ক'রে, উগ্রদেব-ঘোষা শশ্বতী সমীপে এই বার্ত্তা বিবৃত ক'রে এস।"

২

বৌদ্ধ যুগ

"নালন্দার চিত্রশিল্পী সুনন্দ উদ্যান-পালিকা অমিতার কুশল শুধাচ্ছে; অপগতব্যাধি হয়ে সে সুবিহার করুক এই বক্তব্য। আরও এই বক্তব্য যে, সুনন্দ 'অচাতিয়াণি বর্ষাণি' তোমা' হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে,—হে দেবি,—তোমার স্মরণ পথে উদিত হবার সৌভাগ্য তার হয় কি আজো ?

"ভগবান বুদ্ধের পূজার জন্যে, হে অমিতা, পূত-প্রভাতে যখন উদ্যান-দীর্ঘিকায় সদ্যবিকশিত পদ্মদল চয়ন করতে আসতে, এক ব্যক্তি তোমায় দূর হতে পবিত্র নীলপদ্ম আহরণ ক'রে দিত,—তার কথা কি মনে পড়ে আজো ?—তোমার সে পুষ্পচায়ক প্রতি প্রভাতে হেথায় মুক্ত কানন মাঝে শিক্ষাদাতা ও অন্তেবাসীর সাথে ভগবানের বন্দনায় তোমার আরোগ্য ইচ্ছা করছে।

"পূজা সমাপনান্তে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা হয়ে কক্ষে চন্দনবারি সিঞ্চন কর যখন, হে কল্যাণী,—কক্ষগাত্রের চিত্রপরে তোমার স্নেহস্নিগ্ধদৃষ্টি স্থাপিত হয় কি ক্ষণতরে ?—আজ সে চিত্রকর এই সুদূর বিদ্যাপীঠের ভবন-গাত্রের চিত্রলেখায় তোমারই রূপশ্রী ফুটিয়ে তোলে অজানিতে, তার চিত্র তুলিকার টানে।

"অগ্নিবর্ষী গ্রীষ্মমধ্যাহ্নে ক্লান্ত কপোত যখন আশ্রয় নেয় অলিন্দ মাঝে, তোমার উদ্যানে যখন সমাপ্ত হয় পুষ্প বিক্রয়,

শীতল হর্ম্ম্যপরে শয়ন ক'রে, ওগো পরিশ্রান্তা, কী মধুর চিন্তায় চিত্ত তোমার ভরে ওঠে? উদ্যানমুখী গবাক্ষপথে সেই যে পলাশ তরুর পরিচিত পুষ্পিত শাখাটি বাহু বাড়িয়েছে, পিপীলিকাগুলি সারি দিয়ে যাতায়াত করছে, রক্ত-পুষ্প দু'একটি পাষাণ হর্ম্ম্যতলে টুপটাপ ক'রে ঝরে পড়ছে,—সেই দিক্ পানে চেয়ে মনে পড়ে কি তোমার কোনও প্রণয় স্মৃতি?—তোমার প্রেমিক, হে ভাবালসনয়না, পল্লববিপুল এই আম্রবৃক্ষছায়ে অভীক্ষ্ণং তোমার প্রণয় চিন্তায় মগ্ন আছে।

"স্নিগ্ধসন্ধ্যায় ভগবানের শিলাস্তূপে যখন আরতিপ্রদীপ জ্বলে ওঠে, হে গৃহলক্ষ্মী, এ প্রবাসীর কুটীরে তখন তুমি দীপাধারে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে দাও, ধূপাধারে তোমার কল্যাণহস্তপ্রজ্বলিত ধূপ হতে নীল ধূম সৌরভে মুখর হয়ে ওঠে, তোমার প্রস্ফুটিত মল্লিকার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হতে অতি মধুর স্নিগ্ধ সুবাস সন্ধ্যাকাশকে সুরভিত ক'রে বুঝি এখানেও ভেসে আসে,—আমার মন সে উদাস করে দেয়।

"কর্ম্মক্লান্ত রাত্রির আগমন সাথে, লিপিবাহক দীর্ঘপথ তার অতিক্রম ক'রে লিপি তোমায় প্রদান করবে যখন, হে সঙ্গী-বিহীনা অমিতা,—পরদেশী সুনন্দের কিঞ্চিৎ চিন্তা চিত্তে তোমার জেগে ওঠে যেন তখন,—যে সুনন্দ পাষাণকক্ষের কম্পিত দীপ-শিখায় স্বকৰ্ত্তিত ভূর্জ্জপত্রে এই লিপি লিখিত ক'রে দিচ্ছে। বক্তব্য ইতি।"

৩

কালিদাসের যুগ

"বিদিশা নগরী হ'তে বিরহিণী মদনিকা, অবন্তী-অবস্থিত দীর্ঘায়ুঃ ভর্ত্তাকে প্রণাম নিবেদন পূর্ব্বক প্রণয়সহ জ্ঞাপন করছে যে তোমার বিরহে সে বড়ই বিকল।

"স্নিগ্ধসুন্দর এই বর্ষায় সকলেই মিলিত হয়েছে; বণিকগণ নীলসাগরে পাড়ি দিয়েছে বধূর কাছে ফেরার তরে, ক্ষেত্রজীবীগণ কৃষকবধূর বিরহ দূর করতে কেকাধ্বনি-মুখরিত কেতকী-সুরভিত আপনাপন কুটীরে প্রত্যাগমন করছে;—ওগো আর্য্যপুত্র, শুধু তোমার প্রণয়ের কী এ রীতি? স্বয়ং প্রকৃতি আজ মেঘবল্লভের আগমনে ঘন নীল নীচোলাবরণ সহ শ্যামল মেখলায় সজ্জিত হয়েছেন; দূরে সেই অয়স্কান্তনিভ পাহাড়-সারি,—শিখরে যার মহাকাল মন্দির, মেঘের আলিঙ্গনে সে পাহাড় আজ বারে বারে বিলুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে। মেঘের লঘুনীলে পাহাড়ের ঘন-শ্যামল বরণ মিলে গিয়ে, রাধার নীলবাসের সাথে শ্রীকৃষ্ণের শ্যামশ্রীর মিলন মনে জাগাচ্ছে। গ্রামের ময়ূরাক্ষী তটিনী মোদের, যাকে দেখে গেছ তুমি উপল আঘাতে ব্যথিত গতিতে বিশীর্ণ দেহে বাধাভরে বয়ে চলেছে, অম্বুবাহের প্রণয় ধারায় পরিপুষ্ট হ'য়ে সে আজ নৃত্যতালে দুলে উঠেছে। আমার দ্বারপ্রান্তের নীপবৃক্ষ

পুষ্পভারে নুয়ে পড়েছে, শাখায় তার স্বর্ণশিকলযুক্ত শিখী আমার নৃত্যসহ কেকাতান তুলেছে।

"আকাশ যেন বিরহিণী সীতার মত আজ অশ্রু ঝরাচ্ছে অনিবার; উদ্দাম বাতাসকে দেখে মনে হয় সে আমার বিরহানুভব ক'রে মেঘকে আমার দুঃখের অভিজ্ঞানস্বরূপ সাথে নিয়ে তোমার পানে উড়ে চলেছে। হে নিষ্ঠুর আর্য্যপুত্র, কবে তুমি দর্শন দিয়ে তোমার প্রিয়াকে অনুগৃহীত করবে?

"চৈত্ররাত্রের এক মধুনিশায়, ওগো প্রিয়, কাণে আমার গুঞ্জন ক'রে বলেছিলে তুমি, 'অয়ি প্রিয়ে, তোমার সাথে হিন্দোলায় দোলার অভিলাষী আমি।'—গ্রামপ্রান্তস্থিত কাননে আজ স্নিগ্ধনীল ফলে ভরা জম্বুবৃক্ষে চন্দনহিন্দোলা দুলিয়ে রেখেছি আমি; তোমার আগমনে কুন্দের অভাবে আমি নিশিগন্ধা পুষ্প ধূপ-সংস্কারিত কেশে ধারণ ক'রে বেণীর বাঁধন এলিয়ে দেব, কনককাঞ্চি কটির খসিয়ে সদ্য-রোমাঞ্চিত নীপমালা মেখলায় সাজিয়ে দেব; মুখর মঞ্জীর মুক্ত ক'রে বৃতিকাকেতকীর কোমল কেশরগুচ্ছ জড়িয়ে দেব লাক্ষারসরঞ্জিত চরণে; বর্ষার আকাশের মত ঘনস্নিগ্ধ অঞ্জন দেব নয়নে, বর্ষাস্নাত শ্যামধরার মত শ্যামল কালাগুরুর গন্ধবাসিত বসন শুক্লাপাঙ্গের বর্হ অঙ্কিত ক'রে ধারণ করব চন্দন-লিপ্ত দেহে। এইভাবে প্রসাধন সমাপ্ত ক'রে মহাকালের ডমরুনির্ঘোষের মত গম্ভীর মেঘমন্দ্রিত তিমিররজনীতে যাত্রা করব তোমার অভিসারে। আমাদের দুজনার প্রণয়বাণী ছাড়া জগতের যাবৎধ্বনি মিলিত হবে বারিধারার মল্লার রাগিণী-

মাঝে, গাঢ় মেঘের গভীর গর্জ্জনে অঙ্গ আমার পুলকিত হবে, বর্ষামালতী যেমন পুষ্পশুভ্র শালতরুকে জড়িয়ে ধরে আমিও আলিঙ্গন করব তোমায় তেমনি ক'রে। হে আর্য্যপুত্র, তুমি আমার জীবনের আনন্দস্বরূপ ; হে প্রিয়, সত্বর হও তুমি,—ধন্য কর প্রিয়াকে তোমার।

"স্বহস্তচিত্রিত বসনে আবৃত এই পত্রের সাথে মণিময় কণ্ঠাভরণ আমার অভিজ্ঞানস্বরূপ অবলোকনার্থ তোমার, প্রেরণ করলাম বিশ্বস্ত অনুচর হস্তে। ইতি মদনিকা।"

৪

মোগল যুগ

"ফতেপুর

"মেরে মুয়াজ্জিজ্ পেয়ারে!

"সেলামাত্—

"তোমার তবিয়ত্ তন্দুরস্থ্ আছে কিনা জানতে আমি ব্যগ্র হয়েছি ; বহুদিন হতে হালাত্ হতে তোমার বঞ্চিত হয়ে, মেরে পেয়ারে, আমার মনে কিছুমাত্র সুখ নেই ; খোদার মর্জ্জিতে শীঘ্র যেন তোমার তন্দুরস্থ্ তবিয়তের হালত্ পাই।

"শুধু তোমার চিন্তায়, অয়ে রৌশেন্-আরা, আমার মন মস্‌গুল্ হয়ে আছে হর্‌ওয়াক্ত্ ; দূরে যখন শীষ্ দিয়ে যায় বুলবুল,

পেয়ারে, তোমার গুল্‌বাগিচার বুলবুলের প্রেমালাপ জেগে ওঠে মনে আমার;—সে বাগিচার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুল্‌টিও, অয়ে আমার সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, তোমার রূপের রোশ্‌নায়ে ম্লান হয়ে যায়; বুলবুল যেমন পাতার ঢাকনা সরিয়ে গোলাপের মুখ দর্শন করে, তেমনি ঐ স্বচ্ছ ওড়না উন্মোচন ক'রে তোমায় এক নজর দেখার জন্যে জী-মেরা অধীর হয়ে থাকে।

"পথে চলার বেলায় নজরে পড়ে যখন নিবিড় মেহেদীকুঞ্জ, তখনি আমার ইয়াদ্‌ হয় হেনা-রঞ্জিত করপুট তোমার, জরীর চটীর মাঝে মেহেদিরাগ-রক্তিম চরণ দু'খানি। কবির ভাষায় আমারও দিল্‌ বলে ওঠে——

'দম্‌নেহা কুনম্‌ জাহির গর্‌চে রঙ্গে নেজাকাম্‌
রঙ্গে মন্‌ দরমন্‌ নেহাঁ চু-রঙ্গে সুরখ্‌ অন্দর্‌ দিলাস্ত্‌।

"অয়ে পেয়ারে, শিরাজী দেখে সুর্মাটানা আঁখি তোমার মনে পড়ে; যে মধুর সরাব পান করেন সাহান শা' বাদসা, তার চেয়েও মদির-করা নেশা জমা আছে ঐ দুটি নীল নয়নে তোমার; মেরে রৌশন-আরা, বেহস্তের হুরী যেন তুমি, এই গরীবের গরীবখানার দৌলত্‌ হয়ে আছ। এ বান্দা তোমার প্রণয়-জন্‌জিরে বন্দী হয়ে গোলাম ব'নে আছে চিরদিন।

"সফেদ্‌ এই কবুতরটি আমার দূত হয়ে যাচ্ছে তোমার পাশে; মেরে পেয়ারে, তুমি মেহেরবাণী ক'রে জেরা তক্‌লিফ্‌

করুণাকর এর কণ্ঠ হতে আমার এই বার্ত্তা খুলে নিয়ে পাঠ ক'রো।

"জিয়াদা তোমার জিয়ারত্ কা-খাঁহা।
নিয়াজমন্দ্ তোমার কবীর খাঁ।"



কোম্পানীর যুগ।

"শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়

কাঞ্চনপুর
২২শে কার্ত্তিক

"শ্রীচরণকমলেষু,

"প্রণামশতকোটি নিবেদনমিদং পরে বহুদিন যাবৎ আপনকার কোন পত্রাদি না পাওনে অধিনী নিতান্ত উদ্বিগ্ন বটে, সত্বর ভবদীয় কুশল সংবাদ প্রদানে এ দাসীর চিন্তা লাঘব করহ। এবং বিদেশে অতি সাবধানে থাকিবেন। যদিস্যাৎ মহাশয়ের কোন রূপ বিপদ বিপত্তি ঘটেক্, সেই ভয়ে আপনকার এ দাসীর মন সতত সন্ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। যেদিন আপনি নির্বিঘ্নে এ বাটীতে আসিয়া পদার্পণ করিবেন, সে দিবস এ দাসী সাতটা সরিষা দিয়া স্নান করিবেক, কুলাইচণ্ডীর বাড়ী গুয়া-পান

দিবেক ও সুবচনীর পূজা করিবেক। সত্যনারায়ণ এখন মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে হয়।

· "গ্রামের যারা সকলে বলে সুতানুটিতে ফিরিঙ্গীরা কুঠি করিয়াছে ; সেখানে মুন্সীর কদর অধিক বটে। পাঁচটার কথায় আপনাকে যাইতে দিয়াছি। পাঁচটার যে মত সেই কর্ত্তব্য।

"এ বাটীর সমস্ত কুশল জানিবেন। কিন্তু গ্রামে কেহ কারও ভাল দেখিতে পারেনা। ভালখাকীরা আমার হিংসায় নিয়ত জ্বলিতেছে জানিবেন। পরম পূজনীয়া শ্রীযুক্তা শ্বশ্রূ মাতা-ঠাকুরাণী বাত-ব্যাধিতে নিতান্ত কাতর হওনে অধীনী দেউল-পোতার জাগ্রত ঠাকুরের দোর ধরিয়া নির্ম্মাল্য যাচিঞা করিয়া তাঁহাকে ধারণ করাইয়াছে জানিবেন এবং তেঁহ এক্ষণে আপাততঃ নীরোগ আছেন।

"লোক পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছি যে সুতানুটিতে কোম্পানীর কুঠিয়ালগণ জাহাজ ভরিয়া নানারূপ দ্রব্য সকল আনিয়া থাকে। ও পাড়ার বিমলাঠাকুরঝী আমাকে প্রায়শঃই বলিয়া থাকেন— তুমি যেরূপ রামায়ণ পড়হ তদ্রূপ সুশ্রাব্য পড়ন প্রায়শঃই শুনা যায় না। মহাশয় বিমলাঠাকুরঝীর জন্য একটি অল্পমূল্যের দর্পণ আনিবেন,—আহা ঠাকুরঝীর বুদ্ধি বিবেচনা উত্তম বটে। দত্ত-বাড়ীর হারু ঠাকুরপো কোন কুঠিতে কর্ম্ম পাইয়াছে বলিয়া শ্রুত হইয়াছি। তাহারই সহায়তায় কাছারী বাটী হইতে কাগজ কলম প্রভৃতি আনায়ন করতঃ এই পত্রখণ্ড আপনাকে লিখি, নতুবা অধীনী নারীজাতি বিধায় কাগজ কলম কুথায়

পাইবেক। ঠাকুরপোর মারফতেই ইহা মহাশয়ের শ্রীচরণে পাঠাইলাম। এমত অবস্থায় তাহাকে কিছু না দিলে উত্তম দর্শায় না। এই কারণে লিখি যে আপনি তাহাকে সাধ্যমত কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিবেন। এবং সর্ব্বশেষে লিখি যে সহরে নাকি একপ্রকার কাচ নির্ম্মিত চুড়ীর আমদানী হইয়াছে, তাহার নাকি লাল নীল নানাপ্রকার বর্ণ বটে। অধীনীর ঐরূপ চুড়ী পরিতে একান্তই বাসনা হইয়াছে। যদি অপরাধ না লয়েন তাহা হইলে আসিবার কালীন ঐ প্রকার দুই জোড়া চুড়ী সঙ্গে আনিবেন। ও পাড়ার ক্ষেমঙ্করী পিসি নথের অহঙ্কারে মাটীতে পদার্পণ করেন না। চুড়ী পাইলে তেঁহকে একবার দেখাই।

"অধিক আর কি লিখিব। আপনি নিকট হইলে যে সকল কথা বলিতে পারি পত্রখণ্ডে সে সকল লিখন যায় না, কিরূপ লজ্জা লজ্জা করে। এবং মাগো যদি কেহ দেখিয়া ফেলে—ছি।

"আমার শত সহস্র প্রণাম জানিবেন
"ইতি প্রণতা দাসী—
শ্রীমতী নৃত্যকালী দেবী।"

দ্বিধা

অস্তোন্মুখ মেঘমুক্ত সূর্য্যের সোনালি হাসি বৃষ্টিধোয়া ফুলে পাতায় ছড়িয়ে পড়ে বিদায় জানিয়ে যাচ্ছে। প্রকাণ্ড দোতালা বাড়ীর চারি পাশে পরিপাটি বাগান। রুচিরা একটা বেতের সাজি হাতে ফুল কেটে ভরছে তাতে। ডাল পালা হতে টুপটাপ ক'রে দু-একটি বৃষ্টি-কণা কেশে কবরীতে ঝরে পড়ে হীরের মত জলছে; মাথা হেলান'র সাথে গাল পর্য্যন্ত নামা কর্ণাভরণ তার ঝলমল করছে মাঝে মাঝে।

কয়েক গুচ্ছ পুষ্প চয়নের পর লনে একটু ঘুরে রুচিরা নদীর পথে অগ্রসর হল,—এটা বাড়ীর পশ্চাৎ দিকে, বড় বড় গাছে ঢাকা পথ। গাছের তলায় তলায় রজনীগন্ধার দীর্ঘ পুষ্পশীর্ষ, ঘন বন গন্ধে উদাস হয়ে আছে,—উপরে নীড়ে ফেরা পাখীর দল কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে তখন। পত্র-বহুল বৃক্ষের ঘনচ্ছায়ে সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্য এরই মাঝে ঘনিয়ে আসছে।

লাল কাঁকর-ঢালা পথ সাদা পাথরের ছুটি বেদীর পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা ফুটন্ত রজনীগন্ধার গুচ্ছ ছিঁড়ে নিয়ে রুচিরা গেট খুলে বাহিরে তাকালে। মাঠের বাব্লা বন নিস্তব্ধ হয়ে আছে; পত্র-হীন আঁকা-বাঁকা ডালের ফাঁকে গলিত রজত-ধারার মত নদী দেখা যাচ্ছে। ওপার ঝাপ্সা হয়ে গেছে; এপারে মেঘের স্তূপে মাণিক জ্বালিয়ে সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে;—নদীর

'পরে নুয়ে পড়া পশ্চিমাকাশ বৃন্দাবনের কোন্ এক হোলির স্মৃতিতে লালে লাল হয়ে উঠেছে।

রুচিরা প্রাচীরে হেলে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল; দিনের পর রাত, রাতের পর দিন দিয়ে অদৃশ্য শিল্পী যে বিনি-সূতার মুক্তাহার গেঁথে চলেন, তার মাঝে দিন রাত্রির রঙীন মিলনক্ষণের অপূর্ব্ব এই মুহূর্ত্তগুলি মধ্যমণির মত জ্বলে উঠে,—কতটুকু সময়ের জন্যে? স্বল্প এই সময়টুকুকে এত শুভ মনে হয় কেন? শতদলবাসিনী সরস্বতী কি এমনই কোন স্নিগ্ধ ক্ষণে কবিকে বাণী দান করেছিলেন;—পদ্মাসনা ইন্দিরা তাঁর মঙ্গল-কলস হতে জগতে সুধাধারা ঢেলেছেন কি এই শুভ মুহূর্ত্তে? সেই মাঙ্গলিকের স্মৃতিতেই সুন্দর বুঝি আজও এ গোধূলি লগ্ন!

পদশব্দে রুচিরার দিবাস্বপ্ন টুটে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌লে একজন যুবক বাড়ীর দিক হতে গেটের পানে আসৃছে। অপরিচিতের অপ্রত্যাশিত আগমনে অবাক হয়ে বিশাল নয়ন দুটি পূর্ণদৃষ্টিতে তার মুখে স্থাপন করলে; যুবকের বিস্ময়-প্রশংসাভরা চাহনিতে অপ্রতিভ হয়ে রুচিরা দৃষ্টি ফিরিয়ে রজনীগন্ধার গুচ্ছটা আনমনে অধরে চেপে ধরলে,—তারপর ধীরে ধীরে বাড়ীর পানে ফিরে চল্ল। মনের মাঝে গুন্‌গুনিয়ে কেবলই প্রশ্নটা ঘুরে ফিরতে লাগল,—"কে এ, এ কে!"

যদি সে ফিরে তাকাত, একজোড়া মুগ্ধ-উজ্জ্বল চোখে ওই প্রশ্নই ফুটে উঠেছে দেখতে পেত।

যুবক রুচিরার চলে যাওয়ার পানে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে

মাঠে নেমে পড়ল একমনে ভাবতে ভাবতে,—মূর্ত্তিমতী সান্ধ্যশ্রীর মত ওকে? বাতাস-লাগা রজনীগন্ধার ফুলশীর্ষের মত লীলায়িত গতিভঙ্গী ও-কার? মেঘচ্ছায়ার মত মেদুর দৃষ্টি কার ও? কতযুগ আগে মৃগয়ান্বেষী রাজা নাম-না-জানা তপোবন-পালিতার কথা এমনি করেই ভেবেছেন হয়ত; চিত্রশালার চঞ্চল-নেত্রার চকিত চাহনিতে তরুণের মন সেদিনও এমনি প্রশংসমান হয়ে উঠেছিল,—অগুরু-বাসিত ধূপধূসর তপোবনের যুগে জল-সেচিকার বল্লরীর মত বঙ্কিম ভঙ্গী, পুষ্প-চায়িকার শারদ মেঘের মত সাবলীল তনুর সহজ তনিমা তরুণের মনকে তখনও মুগ্ধ কৌতূহলে ভরিয়ে দিয়েছে। কালের স্রোতে কূলে কূলে পলি পড়ে চলে বহির্জগতে,—কিন্তু অন্তরের অলকানন্দা সেই আদি গঙ্গোত্রী হতে একইভাবে উৎসারিত হয় বোধহয় চিরদিন।

যোগানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে রুচিরা এসেছে প্রায় দু'মাস হবে। যোগানন্দ সারা জীবনের নিরলস পরিশ্রমে ব্যারিষ্টারিতে উপার্জ্জন করেছেন বিস্তর। তাঁর পত্নী বহুদিন হল গত হয়েছেন, কোনও সন্তানাদিও নেই। যোগানন্দ অক্ষুণ্ন অবসরটা কর্ম্মের ভিড়ে এমনই ভরিয়ে রেখেছেন যে সমস্ত জীবনে একটিও প্রগাঢ় বন্ধুত্ব তাঁর গড়ে ওঠেনি। সে জন্য বিশেষ ক্ষোভ তাঁর ছিলনা কখন, নিজের কাজ কর্ম্মে নিমগ্ন থাকাটাই তাঁর গম্ভীর প্রকৃতির অনুকূল ছিল। অধিক মেলামেশা আলাপ-আপ্যায়নের ঝঞ্ঝাট তাঁর একেবারে অসহ্য। নির্জনতা-প্রিয় স্বভাব ব'লে নিস্তব্ধ নদীতীরে মনোমত ভবন নির্ম্মাণ করিয়ে-

ছিলেন। দ্বিতীয় বার বিবাহ করাটা আর ঘটে ওঠেনি। একান্ত করণীয় এই কার্য্যটি করার জন্যে তাড়া দেবার মত যোগানন্দের গৃহে কেহই ছিল না, অত্যন্ত রাশভারি স্বল্পবাক্ স্বভাবের জন্যে বাহিরের লোকও ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পেত না। যোগানন্দের নিজের দিক হতে বিবাহের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; সমস্ত জীবনটা ধরা বাঁধা নিয়মের মাঝে এমন গুছিয়ে বেঁধে নিয়েছিলেন যে পত্নীর অভাব অনুভব করার যথেষ্ট অবকাশ তাঁর মিলত না। অনবরত পরিশ্রম-নিরত থাকলেও পঞ্চাশ-উর্দ্ধ বয়েসের পক্ষে যোগানন্দের দেহ যথেষ্ট সবল,—এখনও ঋজু। তাঁর ঈষৎ শুভ্র কেশ, বলিরেখাহীন মুখ, বলিষ্ঠ দেহ দেখলে বোঝা যায় এক সময় তিনি সুপুরুষ ছিলেন।

দিন নির্ঝঞ্ঝাটে কাটছিল। বিপদ বাধালেন যোগানন্দের অশীতিপর বৃদ্ধা মাতা। বয়সের আধিক্যহেতু বৃদ্ধার সংসারের সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, জপের মালা ও লাঠিটি নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন এ ঘর ও ঘর, আর দিনের মাঝে বার কয়েক উঁকি মেরে দেখে নিতেন তাঁর ছেলেটি হারিয়ে গেছে কিনা। একদিন সহসা পক্ষাঘাতের আক্রমণ তাঁকে অচল করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিভ্রংশও হতে লাগল। যোগানন্দ জ্বরে তখন শয্যাগত। বৃদ্ধার পরিচর্য্যার কেউ নেই দেখে ডাক্তার একজন নার্সের বন্দোবস্ত করলেন, কিন্তু বৃদ্ধা যে আর উঠতে পারবেন না ও বারো মাসই পরিচর্য্যার প্রয়োজন হবে এ কথাও জানিয়ে দিলেন। বিব্রত যোগানন্দ ডাক্তারকে একজন স্থায়ী সেবিকার

অনুসন্ধানের অনুরোধ জানালেন। ডাক্তার রুচিরাকে নিয়ে এলেন তখন।

রুচিরার পিতা ছিলেন মহামহা পণ্ডিত ও মহামহা অমিতব্যয়ী। উপার্জ্জনের সাথে ব্যয়ে তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। রুচিরা তাঁর বড় আদরের প্রথম সন্তান; তাকে দূরে বোর্ডিংএ রাখতে পারবেন না ব'লে প্রচুর ডিগ্রীধারী ও প্রচুর বেতন-ভোগী কয়েকজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত ক'রে দিলেন; পশ্চিম হতে প্রসিদ্ধ দুজন ওস্তাদ আনিয়ে দিলেন রুচিরার কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত শিক্ষার জন্যে। শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও নিজে অতি যত্নে কন্যাকে ফরাসী, ল্যাটিন ও সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হলে দেখা গেল সঞ্চয়ের খাতা সম্পূর্ণ শূন্য, ঋণের বোঝা ভারী হয়ে আছে। বিধবা মাতা ও অসহায় ভাই বোনের একটা উপায়ের জন্যে রুচিরাকে কর্ম্মের সন্ধান কর্‌তে হল। রুচিরার পিতার অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব ছিল, ডাক্তারও তার মাঝে একজন। তাঁর কাছ হতে সন্ধান পেয়ে রুচিরা সাগ্রহে যোগানন্দের গৃহের কর্ম্ম গ্রহণ করল।

সম্ভ্রান্ত গৃহের আদরে পালিতা এই তরুণীকে সাধারণ সেবিকা-রূপে নিয়োজিত ক'রতে যোগানন্দের সঙ্কোচ লেগেছিল অনেক-খানি। রুচিরার সকল রকম সুবিধার ব্যবস্থা তিনি আগ্রহের সাথে ক'রে দিলেন। যোগানন্দের মত রাশ-ভারি লোকের রুচিরার প্রতি সসম্ভ্রম ব্যবহার দেখে সকলে তাকে বেতন-ভোগী সেবিকার অনেক উচ্চেই স্থান দিলে। শোক ও ভাবনার ঝড়

ঝাপ্টা হতে নবপ্রাপ্ত কর্ম্মের আশ্রয়ে এসে রুচিরার দিনগুলো কতকটা স্বস্তির মাঝে কেটে যেতে লাগল।

যোগানন্দের একলা-চলা জীবনে রুচিরার আবির্ভাব অনেকখানি নূতনত্ব আনলে। তার কমনীয় মধুর ভাব অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া গৃহলক্ষ্মীর অভাব তাঁর মনে জাগিয়ে দিলে সহসা। জটিল বৈষয়িক কর্ম্ম ও ব্রীফের স্তূপ হতে একটি তরুণীর সরস সঙ্গ যে অধিক তৃপ্তি দায়ক একথা অত্যন্ত অস্বস্তির সাথে স্বীকার করতে হল তাঁকে। কর্ম্মে সমাহিত জীবনের নূতন এ বিক্ষোভে চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি.—জীবনে যখন ভাঁটার টান, অন্তরে জোয়ার কেন আর! কিন্তু যুক্তি জুটল ক্রমে। বয়স তাঁর অধিক হলেও এখনও ত সবল কর্ম্মক্ষম রয়েছেন। অর্থের অভাব তাঁর নেই। রুচিরার অমিতব্যয়ী পিতার অবর্ত্তমানে তাকে পথে বসতে হয়েছে, যোগানন্দের অবর্ত্তমানে তাকে পথে বসতে হবে না। আর যোগানন্দ না হয় পঞ্চাশ পেরিয়েছেন, রুচিরাও ত শিশু নয়।···

ভাবনা চিন্তার পর একদিন প্রভাতে প্রাতরাশের সময় রুচিরা যখন চা ঢেলে দিচ্ছিল, যোগানন্দ গম্ভীর মুখে বিবাহের প্রস্তাবটা জানিয়ে দিলেন। প্রবল বিস্ময়ের ঢেউয়ে রুচিরার হাত হতে ছল্‌কে পড়ে সোনালি চা শুভ্র আবরণকে মলিন করে দিলে খানিকটা। এই বয়সে উচ্ছ্বাস প্রকাশে নিজেকে হাস্যাস্পদ না ক’রে তোলার জ্ঞান যোগানন্দের ছিল, তিনি তাই সংক্ষেপে নিজের মনের যুক্তিগুলো প্রকাশ করলেন, প্রস্তাবটা রুচিরাকে ভাল ক’রে বিবেচনা ক’রে উত্তর দিতে ব’লে নীরব হয়ে গেলেন।

রুচিরা হিমে জমে যাওয়া মূর্ত্তির মত স্তব্ধ ভাবে বসে রইল,—আলো পড়ে যোগানন্দের রূপালি কেশ ঝিকমিক করছিল যেখানটায় সেই দিক পানে চেয়ে।

যোগানন্দকে উত্তর দিতে হবে,—রুচিরা দিনের কর্ম্ম ভুলে চিন্তায় তলিয়ে যায়। রাতের নিদ্রা হারিয়ে ভাবনার ভরে ভেঙে পড়ে। বিবাহে সম্মতি দেবার সপক্ষে কোন সাড়া সে নিজের মাঝে খুঁজে পায় না, যোগানন্দের যুক্তিগুলো নিয়েই নাড়া চাড়া ক'রতে থাকে। এতদিন তার কেটেছে পুস্তকের স্তূপে,—কাব্য ইতিহাসের পাতায় লুপ্ত নগরীর মাঝে মাঝে,—ধ্বংস রাজ্যের হারিয়ে যাওয়া রাজার সন্ধানে; কত না-জানা না-চেনা দেশের দেখা পেয়েছে,—চন্দ্রের উদয়ারম্ভে চঞ্চল সমুদ্রের ঢেউ লেগেছে তার মনে,—কত তুষার-ভরা মেরুপথের হরিণ-টানা রথ, কত জ্বলন্ত তপ্ত মরুবালিতে উটের শ্রেণী, কত নীলনদ-তটে দ্রাক্ষালতায় ছাওয়া মর্ম্মর হর্ম্ম্যে মিশর নন্দিনীর সন্ধানে, কৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ শিখরে ভারতের সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি, গ্রীসের গৌরব যুগ;—আরো আগে সেই প্রাণীহীন, বাণীহীন বসুন্ধরা,—একটি বৃক্ষ একা যখন মাথা জাগিয়েছে, তার পর হতে কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, কত জয় পরাজয়,—দিনের পর রাতও কেটেছে কত,—রুচিরার প্রদীপ জ্বালান অধ্যয়নে।·····

এখন তাকে আত্মনির্ভর হতে হয়েছে; অল্প এ কদিনে সে যেন অনেকখানি বেড়ে গেছে মনে হয়। এরই মাঝে বহুদিনের দেখা স্বপ্নের মত ভেসে আসে সে সব দিনের স্মৃতি। যোগানন্দের

বয়স তার তুলনায় এমনই কি আর অশোভন এখন। যোগানন্দের যৌবনের চাঞ্চল্যহীন মূর্ত্তিরও এক ধরণের গৌরব আছে অস্বীকার করা যায় না। তিনি বলেছেন অর্থের অভাবে তাকে পড়তে হবে না কখনও। যা খেয়ে রুচিরা দেখেছে বাস্তব জগতে অর্থের প্রয়োজন নেহাৎ অল্প নয়। রুচিরা কার প্রতীক্ষাতেই বা অপেক্ষা কর্‌বে?—সে ত কাউকে চেনে নি।...কিন্তু কর্ম্মহীন দ্বিপ্রহরে যখন জানালা দিয়ে দেখা যায় নদীর জল জ্বলে উঠেছে হীরের মত,—পাল-তোলা নৌকার সার মন্থর গতিতে বেয়ে চলেছে, নিস্তব্ধতার মাঝে টিটিভের তীক্ষ্ণধ্বনি করুণ হয়ে ভেসে আসে, তখন সেই না-দেখা অচেনার চিন্তা মনকে আন্‌মনা ক'রে দেয় কেন? ওই আকাশছোঁয়া মাঠে বাব্‌লা ডালের ফাঁকে দুয়োরাণীর দুলালের দেখা কি মেলে না? বক্রোচ্ছল নদী বেয়ে রাজপুত্রের সোনার ময়ূরপঙ্খী এ ঘাটে কি লাগেনা?... যোগানন্দের মাতার আর্ত্তনাদে স্বপ্ন ভেঙে যায়, মনে পড়ে সে রূপকথার রাজকন্যা নয়, তাকে জীবিকার্জ্জন কর্‌তে হয়।

মীমাংসার কোন কূল আর মেলে না;—ক্লান্ত হতাশ হয়ে সে যোগানন্দকে সম্মতি জানিয়ে দিলে,—আর ত অনিবার ভাবতে পারা যায় না। যোগানন্দ প্রসন্ন হলেন, বিবাহ কয়েক মাস পরে হবে স্থির হল। বিবাহের সংবাদে কেউ হাসলে, কেউ বা অনুতাপ করলে। রুচিরা এখনও সেবিকা রূপে রইলেও গৃহে বাহিরে সকলে তাকে যোগানন্দের ভাবী পত্নীরূপে দেখতে লাগল।

* * * * *

দ্বিধা

চাঁদের আলোর শুভ্র ধারাটি আলাপন-কক্ষের বাতায়ন-পথ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, বাতায়নের কাছে একটা ডাইভানে হেলে-বসা রুচিরার চরণে বসন লুটচ্ছে, অন্ধকারে বসে আলোভরা আকাশের পানে চেয়ে আনমনে সে কি ভাবছিল। এ সময় রুচিরার অবসর বিশেষ থাকে না; যোগানন্দের মাতার ধারণা অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তিনি যে আহার সমাপন করেছেন সেটি দাসীদের রচা কথা,—তারাই আহার্য্যটা পরিপাক করে তাঁর নামে দোষারোপ কর্‌ছে। এই নিয়ে নিত্য তিনি ঘোরতর গোলযোগ বাঁধিয়ে তোলেন, রুচিরা গিয়ে তাঁকে শান্ত করে। আজ তিনি নিদ্রামগ্ন হওয়ায় সে ছাড়া পেয়েছে। চাঁদের দিকে চেয়ে চোখ জ্বালা করে, তবু রুচিরা দৃষ্টি ফেরাতে পার্‌ছিল না; ও যেন এক মায়াদর্পণ, কত দিনের কত প্রিয় মুখ ওতে আভাসে জেগে উঠে, কত হারিয়ে যাওয়া ফিরে পাওয়া বন্ধু আবার মিলিয়ে যায়। জগতে সবই ত অম্‌নি মিলিয়ে যায়, মুছে যায়! ...বৈজ্ঞানিক বলেন তবু নাকি হারায় না কিছুই! তুচ্ছ একটি বাণী, ক্ষুদ্র একটি কাজ এরাও যদি অক্ষয় হয়ে বাজছে অনন্তে অবিরত, তবে হারিয়ে যাওয়ার কেন এ অনিবার্য্য হাহাকার! ভাণ্ডার ভরাই আছে, তবু তা হতে বিযুক্ত থাকার আনন্দ,—মহারাজর্ষির ব্রতের এ নিত্য দীক্ষা মানব-মন কি গ্রহণ কর্‌তে পার্‌ছে?...যোগানন্দের কথার সাড়ায় রুচিরা একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে বস্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে যোগানন্দ ঘরে ঢুকলেন।

"একি অন্ধকার যে" বলে সুইচ্ টিপে দিলেন। রুচিরাকে

দেখে বল্লেন, "এই ধ্রুব এসেছে", সাথের আগন্তুকের পানে ফিরে বল্লেন,—"ইনি রুচিরা।"

রুচিরার মন একটা প্রশ্নের উত্তরে ও অনেকখানি বিস্ময়ে ভরে উঠ্‌ল; ঈষৎ হেসে সে প্রতিনমস্কার জানালে। ধ্রুবর আগমন সংবাদ শুনেছিল সে; কিন্তু কেমন ক'রে জানবে কঙ্কগাত্রের ছবির ওই ডিগ্‌ডিগে রোগা কিশোরটি ইস্পাতের তরবারের মত তেজোদৃপ্ত এই দীর্ঘকায় যুবা।

ধ্রুবর দিক হতেও বিস্ময়ের শেষ ছিল না। তার জ্যেষ্ঠ-তাতের আগামী বিবাহের সংবাদে সে ভেবেছিল শুষ্ক বেতের মত নীরস কোন শিক্ষয়িত্রী অথবা আয়োডোফর্মের গন্ধে আকুল এক লেডী ডাক্তারকে দেখবে যেয়ে; কিন্তু বসন্তে বিকশিত মালতী মঞ্জরীর মত এই তরুণী!

নিজেকে সংবরণ ক'রে ধ্রুব বল্লে, "বাগানে আপনাকে দেখে মোটেই চিন্তে পারিনি, আমি ভাবিনি কি না—" কী যে ভাবেনি সেটা আর বলা হল না।

রুচিরা বল্লে, "আপনি ত অনেকদিন বাদে এখানে এলেন, না? দিনকতক থাকতে পারবেন বোধ হয়?"

"ইচ্ছে ত আছে। জ্যাঠামশায়ের এ জায়গাটা ভারি ভাল লাগে আমার।" আরও দু একটা কথার পর রুচিরা যোগানন্দের মাতার কাছে চলে গেল। যোগানন্দও কাগজ পত্র দেখতে উঠে গেলেন। মঞ্জরিত হাস্নাহানার একটা শাখা জানালা পর্য্যন্ত উঠে এসে জ্যোৎস্নার পটে আঁধার রেখা টেনে দিয়েছে। ধ্রুব

জানালার ধারে যেয়ে সেইদিকে তাকিয়ে খানিক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর রুচিরার পরিত্যক্ত আসনটায় বসে পড়ে দীর্ঘকেশগুলাকে টানতে টানতে ভাবতে লাগ্‌ল।

যোগানন্দের শূন্য অন্তরে এই ভ্রাতুষ্পুত্রটির প্রতি কতকটা মমতা জমা ছিল; ধ্রুবও সে স্নেহ উপেক্ষা কর্‌তে পারে নি। যোগানন্দের নিরালা গৃহে প্রায় তাকে আসতে হতো। জ্যেষ্ঠ-তাতের সম্পত্তির প্রার্থী সে ছিল না কোন কালে; নিজের পৈতৃক বিষয় যথেষ্ট ছিল; পিতার উপার্জ্জিত সম্পত্তি আলস্যে ভোগ করার তার একটা আন্তরিক ঘৃণা থাকায় ধ্রুব বার্মিংহামে প্রবাসী হয়ে কয়েক বছর এঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন ক'রে সম্প্রতি ফিরেছে; উপার্জ্জনও মন্দ কর্‌ছে না।

শিশুকাল হতে আনাগোনায় নিঃসঙ্গ যোগানন্দের প্রতি ধ্রুবর মনে অনেকখানি শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ তরুণী ও বৃদ্ধের এই সংযুক্ত ছবি তার মনে কী এক বিপ্লব জাগিয়ে কিছুতেই পূর্ব্বের সহজ সম্বন্ধটি বজায় রাখ্‌তে দিচ্ছিল না; এক হাতে কপালটা চেপে নত মস্তকে বহুক্ষণ সে ভাব্‌লে বসে;—নিঃশেষিত-আয়ুঃ প্রাচীন বৃক্ষের হেলেপড়া কর্কশ কাণ্ডে জড়িয়ে যাবে এই নববর্ষার বন-বেলার ব্রততী?...

*   *   *   *   *

এক পক্ষ কেটে গেছে। রুচিরা অত্যন্ত আন্‌মনা আজ-কাল, বক্র-কৃষ্ণ পক্ষ্মতলে তার বিশাল চোখ দুটি সর্ব্বদা ক্লান্ত

সকরুণ। যোগানন্দ আজকাল পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর, অকারণ কর্ম্মে ব্যস্ত। গাম্ভীর্য্যের হাওয়া ধ্রুবরও লেগেছে বোধ হয়, তাকেও অধিকাংশ সময় চিন্তামগ্ন দেখায়। গৃহের এ ভারাক্রান্ত আবহাওয়া, শুধু যোগানন্দের মাতার কোন পরিবর্ত্তন হয় নি, তিনি পূর্ব্বের মতই আহারের সময় আব্দার, নিদ্রার সময় রোদন এবং সকল সময়ই আহার নিয়ে তুমুল গোলযোগে ব্যস্ত থাকেন। তাতে ভারাক্রান্ত নিস্তব্ধতা আরও ভয়াকুল হয়।

নির্জ্জন মধ্যাহ্নে আলাপন-কক্ষে বসে রুচিরা সবুজ একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। ধ্রুব কক্ষে প্রবেশ করলে; রুচিরা অন্তরে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলে; ধ্রুবর প্রতি প্রথম দিনের সহজ ভাব কেমন ক'রে কবে সে হারিয়ে ফেলেছে।

ললাটের স্বেদ রুমালে মুছে ধ্রুব বল্লে,—"কী গরম।"

"বেড়াতে গেছলেন?"

বেতের চেয়ার একটা রুচিরার কাছে টেনে নিয়ে বসে ধ্রুব বল্লে, "হাঁ, কিন্তু যা রোদ। কি পড়ছেন এটা? কালকের বইখানা শেষ হয়ে গেছে?"

"Babbit? হাঁ, সেটা শেষ হয়ে গেল।"

"কেমন লাগল Sinclair Lewis-এর লেখা?"

"অন্যায়কে অগ্রাহ্য করার একটা সহজ ভঙ্গী মনের ওপর ছায়া না ফেলেই যায় না। Sinclair Lewis কিন্তু যেন অত্যধিক cynic, অতটা আপনার সহ্য হয়?"

ধ্রুব একবার রুচিরার পানে চাইলে, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে

বল্লে, "যার অনুভব করার শক্তি অধিক, তার cynic হয়ে যাবার সম্ভাবনাও অতিরিক্ত। অন্যায়কে অনুভব করলে তাকে পরিপাক করা আরো যে অশোভন।"

রুচিরা চমকে উঠে ধ্রুবর দিকে তাকালে। তার মনে উচিত অনুচিতের যে দ্বন্দ্ব অহর্নিশি চল্‌ছে, ধ্রুব কি তারই সার কথাটি বলে দিচ্ছে? হাতের বইটা নামিয়ে রেখে সে একটু সরে বস্‌লে।

রুচিরাকে নীরব দেখে বইটা তুলে নিয়ে ধ্রুব জিজ্ঞেস করলে, "কতটা পড়্‌লেন এ বইটার? ভাললেগেছে 'Forsyte saga'?"

রুচিরাকে উত্তর দিতে হল। বল্লে, "এটা আমি অনেক বার পড়েছি। ভাল মন্দ লাগার বাইরে ও বইটা, মনে হয়।"

আশ্চর্য্য হয়ে ধ্রুব বল্লে, "এতবড় ভাবেন এটাকে?"

"বড় ত ভাবি না। ও যেন চিরন্তন মনের দ্বন্দ্ব দুঃখ দিয়ে তৈরী, একান্ত অন্তরের কথা। দেখুন—যে ভাবে, সে দরদীও হতে পারে।"

নিরন্তর সংঘর্ষে রুচিরার মনের দুয়ার কতটা আল্‌গা হয়ে গেছে কিছুই সে জানে নি, কথাগুলো কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে এল।

ধ্রুবের মনে চাঞ্চল্যের বিদ্যুৎ খেলে গেল—দরদের অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ করবে কি? ব্যগ্র পুলকে কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, একজন দাসী এসে রুচিরাকে বৃদ্ধার কাছে ডেকে নিয়ে চলে গেল। অধর দংশন ক'রে ধ্রুব নীরব হয়ে রইল।......

মৃদু বৈকালী আলোয় বেদীতে বসে রুচিরা দেখছিল করবীর একটা নুয়েপড়া শাখে দুটো শালিক স্ফীতপক্ষ হয়ে আলাপে ব্যস্ত; কয়েকটা কাঠবেরালি ঝরাপাতার মাঝে চঞ্চলচরণে নেচে বেড়াচ্ছে। ওপারের নৌকা হতে মাঝিদের ভাটিয়ালি সুরের মধুর মূর্চ্ছনা—কতদূরের পাখীডাকা ছায়াঢাকা বটমূল, কাকচক্ষু দীঘির জল, জ্যোৎস্নাধোয়া মাঠের ক্ষীণ পথশেষে ঘন তালবন, পল্লীবালার প্রদীপ-প্রজ্জ্বলিত গ্রামের শান্ত শ্রীর স্বপ্ন মনে জাগিয়ে দিচ্ছে। পাশে কতকগুলো ফুল পড়ে, হাতে একটা সেলাই নিয়ে রুচিরা অলসভাবে মাঝে মাঝে বুন্‌ছে। এ কয়দিন রুচিরার অন্তরে যে সাড়া জেগেছে, তাকে স্বীকার কর্‌তে নিজেই সে সাহস পায় না। ধ্রুবকে সে প্রাণপনে পরিহার ক'রে চলতে চেষ্টা করে। রুচিরার পানে চাইলে ধ্রুবর নক্ষত্রের মত স্বচ্ছোজ্জ্বল নয়নে যে আলো ঝল্‌সে ওঠে—তা দেখে আঘাত-লাগা সেতারের তারের মত রুচিরার চিত্ত কেঁপে ওঠে;—সমস্ত শক্তিকে সংহত ক'রে সে আকর্ষণ হতে নিজেকে বিছিন্ন ক'রে দেয়। যোগানন্দের বাগ্‌দত্তা বধূ সে,—এতই কি লঘু চিত্ত তার?

"কতক্ষণ এলেন এখানে?"

মাঠের পথ দিয়ে ধ্রুব এসে উদ্যানদ্বারে প্রবেশ কর্‌লে।

প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে রুচিরা বল্লে,—"নদীর ধারটা ভারি সুন্দর, না?" বেদীর একপ্রান্তে বসে পড়ে ধ্রুব বল্লে, "হাঁ, তাই একবার ভাল ক'রে ঘুরে এলাম, কাল সকালে চলে যাচ্ছি কি না।"

রুচিরার হাত হতে সেলাইটা খসে পড়্‌ল। দুজনে খানিক নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

নদীর গা ঘেঁসে একদল হাঁস উড়ে চলে গেল কোন্ দূরতম প্রবাসে। ধ্রুব সেই দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে ছিল। আপন মনে বল্লে, "এখানে আমার আসা আর হবে না কখন।"

"কেন?"—অতর্কিতে কথাটা বেরিয়ে এল। এ সব প্রশ্ন করবার সাহস রুচিরার কিছু মাত্র ছিল না।

দৃষ্টি ফিরিয়ে ধ্রুব অচঞ্চল চোখে রুচিরার দিকে চাইলে, তারপর বল্লে, "আর দেখা আপনার নাও পেতে পারি; একটা কথা তাই জিজ্ঞেস করতে সাহস করছি, ক্ষমা করবেন।" একটু থেমে বল্লে, "আচ্ছা, জ্যাঠামশায়কে বিয়ে করতে সত্যি কি আপনি রাজী হয়েছেন?"

যে চিন্তাটাকে সে সর্ব্বদা চেপে রাখ্‌তে চায়, ঠিক এই লোকটি তাকে জাগিয়ে দিলে চিত্ত যে তার উদ্বেল হয়ে ওঠে! যে উৎস পাথর চাপা দিয়ে আপনাকে লুকিয়ে রাখতে চায়, পাথরে ঘা পড়্‌লে সে যে শত সহস্র ধারায় ধরণীর বুক ফেটে বেরিয়ে আসে।

স্বপ্নালস দৃষ্টি সুদূরে মেলে কোন মতে রুচিরা বল্লে,—"ওঁর কাছে আমার অনেক ঋণ; অকৃতজ্ঞ হতে ত পারি না।"

ধ্রুবর চোখ জলে উঠ্‌ল—সোজা হয়ে বল্লে, "আপনি কি বলতে চান জীবনটা কৃতজ্ঞার দেনা শুধতে শুধু? অন্য সব

অনুভূতিকে মুছে ফেলে কৃতজ্ঞতাকে আঁকড়ে থাকাই জীবনের চরম লক্ষ্য ?"

"সেও একটা কাজ করা।" এ প্রশ্ন কেন আর, সংশয়ের কি শেষ হয় নি ? দ্বন্দ্ব কি মিটবে না এ জীবনে ?

"এ কাজে জয় হবে অন্যায়ের। মনকে দাবিয়ে দেনা পাওনাকে বড় করেছেন,—সুদ লাগবে যে সারা জীবনটির !"

কথার আঘাতে বাতাসে বাঁশপাতার মত কাঁপন জাগে রুচিরার যুক্তি সংকল্পে ; কী বলবে সে ?

তাকে নীরব দেখে স্নিগ্ধকণ্ঠে ধ্রুব বল্লে, "জিনিষের একদিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে চোখে এমন ধাঁধা লাগে,—সে দিকটাই একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়ায় ; এর মাঝে ভ্রান্তিও ত থাকতে পারে।"

"আমি ত অনেক ভাবলাম ; এ সঙ্কল্প আমার কেবলই কি ভ্রান্তি ?"—দীর্ঘ চিন্তাপথ পারে এতক্ষণে কি দেখতে হবে ভ্রান্তির নেশায় তার দিন কেটেছে ?

অনুনয়-নম্র কণ্ঠে ধ্রুব বল্লে, "নির্ভুল আমরা ত কেউ নই—কৃতজ্ঞতার খাতির ছেড়ে অন্যদিক হতেও একবার দেখুন,—অন্যায়ের স্বপক্ষে আর যুক্তি খুঁজে পান কি ?"

দূরের পানে চেয়ে রুচিরা নীরব হয়ে রইল। কি উত্তর আছে তার ?

খানিক অপেক্ষা ক'রে ধ্রুব বল্লে, "কৃতজ্ঞতার খাতিরে অনেক কাজ করা চলে, কিন্তু বিয়ে করতে, সংসার চালাতে ওর চেয়ে

ঢের বেশী আরো চাই যে।" রুচিরার দিকে প্রদীপ্ত নয়নে চেয়ে বল্লে, "ন্যায়ের দিকে চেয়ে ভালবাসাটাকে ভুলেছেন আপনি, কিন্তু দেখবেন ওটাই সব থেকে বড় সত্য জগতে,—ওর অভাবে সবই ফাঁকি।"

রুচিরার শুভ্র মুখ আরো সাদা হয়ে গেছল। দুলে ওঠা ডাল হতে বৃষ্টিফোঁটার মত অনেক বিনিদ্র রজনীর গড়ে তোলা সঙ্কল্প তার নিঃশেষে ঝরে পড়ল এবার, কিন্তু বাঁধন যে সে গ্রহণ করেছে—উপায় কোথায়,—হতাশ-করুণ সুরে সে বল্লে, "কী আমার করবার আছে আর এখন ?"

—"সবই ত রয়েছে"—ঝুঁকে পড়ে আগ্রহ-নিরুদ্ধ স্বরে ধ্রুব বল্লে,—"ও ভুল পথ ছেড়ে দাও রুচিরা, আসতে পারবে আমার সঙ্গে ? ভুলকে ভেঙে দিয়ে চলে আসতে পারবে কি ?"

দীর্ঘ নীরবতার পর রুচিরা একটা করবীর পাপ্‌ড়ী খসিয়ে ছিন্ন করতে করতে অতি ধীরে বল্লে,—"পারব বোধ হয়..." তারপর বল্লে, "জ্যাঠা মশায় ভারি রাগ করবেন কিন্তু আপনার ওপর।"

উচ্ছ্বসিত আনন্দে ধ্রুব সহাস্যে বল্লে, "তা করুন। সমস্ত জগৎটার রক্তচোখ উপেক্ষা করা যায় যার গুণে সেই মাণিকের সন্ধান যে আজ পেয়েছি।"

প্রত্যাবর্ত্তন

১

তন্দ্রালস মধ্যাহ্নে নির্জ্জন সোপান বেয়ে দুটি তরুণ-তরুণী কামাখ্যা পাহাড়ে উঠছে। চারিপাশে অথই ঘন অরণ্য, কাঁটা-ভরা বেত আর চক্রাকৃতিপত্র বন্য-পামের নিবিড় আলিঙ্গনবদ্ধ কুঞ্জ হ'তে মণি-মাণিক্যের টুকরোর মত প্রজাপতির ঝাঁক শরৎকালের লঘু মেঘের নিঃশব্দ গতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে,—ঘুমের দেশের পরী যেন, গতিভরা কিন্তু বাণীহারা। দূর হ'তে কাঠ-ঠোক্‌রার কর্ম্ম-নিষ্ঠার সঙ্গীত কোমল হ'য়ে ভেসে আসছে,' ঘুঘুর হিল্লোলিত উদাস উচ্ছ্বাস আকাশকে উদাসী ক'রে তুলেছে। কোন খানে এক নাম-না-জানা গাছে একগাছ বনফুল সবুজের বুকে রঙের প্রদীপ জ্বালিয়ে ফুটে আছে। দীর্ঘপত্রের অন্তরালে বন্য কদলীর গুচ্ছ ভারে ভারে নত হ'য়ে আছে, নিশীথরাতে বনের ঐরাবত নিমন্ত্রণ নিতে আসে সেখানে। কালো পাথরের 'পরে কোথাও শ্যামল শেওলা ভ'রে আছে, কোথাও পার্ব্বত্য সর্প অঙ্গ এলিয়ে পুঞ্জিত ঘৃণার মত জ'মে রয়েছে। বর্ষার বিদায়ের বৃষ্টি-চুম্বন তখনও বৃক্ষে পল্লবে শাখায় শাখায় সজল হ'য়ে লেগে আছে। তপঃশীর্ণা অপর্ণার মত বর্ষান্তে ক্ষীণা ঝরণার মৃদুরেখা সবুজ আঁধারকে

উজ্জ্বল ক'রে এক একবার চম্‌কে উঠ্‌ছে। এই নিবিড় অরণ্যের ওড়নার আড়ালে পাহাড়টি যেন কোন্ এক রহস্য-জগতে ডুবে রয়েছে, বনের ঘন অন্ধকারে বিশাল বৃক্ষলতায় কী যেন এক গোপন মন্ত্রের নীরব জপন অহর্নিশি চল্‌ছে,—তারই আবেশে সারা দেশ মূর্চ্ছাতুর স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে আছে।

তরুণ তরুণীর হাতে হাত জড়িয়ে নিয়ে বললে,—"কী সুন্দর......।" শিপ্রা তার অনুপম চোখের আধেক দৃষ্টি ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—"কোন্‌টা অত মন ভোলালো ?"

সন্দীপ বললে, "ঘুমজড়ানো দিনের এই দেশটা ;—এসব নিঃশব্দ বন-জঙ্গলের সঙ্গে দিনটাও কী আশ্চর্য্য খাপ খেয়েছে দেখ্‌ছ ? সবারই একটা ঘুমন্ত ভাব, না ?"

"নাঃ, তুমি নেহাৎই কবি হ'য়ে উঠ্‌ছ—"

সন্দীপ বললে, "না হ'য়ে উপায় কি ? যে প্রেরণা রয়েছ তুমি সঙ্গে !"

শিপ্রা বললে, "আহা, সত্যের অপলাপ কর কেন ? কবিত্বের খোরাক দিচ্ছে তোমায় এই বিকট জঙ্গল,—আমি নয় গো ! আমায় আর ঠাট্টা কেন বাপু ?...আচ্ছা, তুমি ছোটবেলায় আর একবার এখানে এসেছিলে, না ? তখনও কি এমনই প্রেরণা সব পেয়েছিলে ?"

সন্দীপ বল্‌লে, "নিশ্চয়, তা আর পাইনি ? অনাগত তোমার প্রেরণা থেকে কি আমি ফাঁক্ পেয়েছিলাম ভাব' ?"

শিপ্রা বল্‌লে, "ও বাবা, এ যে আমায় চোখে দেখার আগে আমার স্বপন চোখে লাগল দেখছি !"

সন্দীপ বল্‌লে, "ঠিক বলেছ তুমি! ওটি আমারই নিজস্ব ভাব। আমি প্রকাশ করব করব করছিলাম এমন সময় দেখি কবি ওটা প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন।"

শিপ্রা বল্‌লে, "ক'রে ফেলে আমায় বাঁচিয়েছেন। নইলে কবি-সম্রাটের সম্মান লোকে যদি তোমায় দিয়ে ফেলত তা হ'লে গর্ব্বে কি আর তুমি আমার সঙ্গে কথা কইতে, ভাব'?...আচ্ছা তুমি আগেও যখন এসেছিলে, তখনও এ সব এমনি ছিল নাকি?"

সন্দীপ বল্‌লে, "হাঁ ঠিক এই রকমই ছিল। পরিবর্ত্তনের কোন চিহ্ন এর গায়ে দাগ ফেলে না, আর এর একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। সেবার মনে আছে যেন একটা প্রচণ্ড শক্তি আমায় কোথায় বনের মাঝে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।"

দুষ্টামির হাসি হেসে শিপ্রা বল্‌লে, "ওঃ, তা হ'লে তোমার একটা প্রচ্ছন্ন অতীত রয়েছে বল? সেই জন্যই সময় সময় তোমাকে একটু আন্‌মনা দেখি!"

সন্দীপ ঈষৎ গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে, "ঠাট্টা নয় শিপ্রা, সে যে কী একটা অস্বাভাবিক অনুভূতি তা বোঝান যায় না। কোথায় হারিয়ে গেছলাম কিছু মনে নেই—যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শেষে যখন ঘুম ভাঙলো তখন সঙ্গের লোকজন দেখিনি। একটা পাণ্ডা বাড়ী পৌঁছে দেয়।"

শিপ্রা অন্তরে শিউরে উঠ্‌ল। একটু স'রে এসে উজ্জ্বল চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি সন্দীপের মুখের 'পরে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, "সত্যি তুমি হারিয়ে গেছলে এখানে?"

সন্দীপ তার চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'রে লঘু সুরে বললে, "হাঁ গো! কিন্তু এবার আর হারাবার জো নেই; তোমার যে কঠিন বন্ধন, তা কাট্‌তে পারে এমন ইন্দ্রজাল ত দেখিনে!"

শুষ্ক হেসে শিপ্রা বল্‌লে, "তবু সাবধানে থাকাই ভাল। জান ত কামাখ্যায় এলে মানুষ ভেড়া হ'য়ে যায়। শেষে কি ভেড়া চরাতে চরাতে আমায় হায়রাণ হ'তে হবে!"

খানিক দূরে যেয়ে একটা সাদা ফুলে-ভরা গাছ দেখে সন্দীপ উল্লাসে বলে উঠ্‌ল, "বাঃ, এটি আজও তেমনি রয়েছে, যেমনটি আমি দেখে গেছ্‌লাম।"

শিপ্রা তাড়াতাড়ি গোটাকতক ফুল তুলে নিয়ে বললে, "দাঁড়াও, তা হ'লে গাছটাকে ভাল ক'রে চিনে নিই। ও যে আমার 'ভর্ত্তৃমিত্রং'—"

কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। ঘুমপুরীর রাজকন্যার মত নীরব নিথর অরণ্য তার ঘনকুন্তল খররৌদ্রে এলায়িত ক'রে নিদ্রামগ্ন হ'য়ে আছে। নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশ হ'তে দীপ্ত সূর্য্যের রশ্মিধারা ঝ'রে প'ড়ে নিদ্রিতা সুন্দরীর সারা অঙ্গ সন্তর্পণ চুম্বনে ছেয়ে দিয়েছে। মধ্যাহ্নের অলসবাতাস পুষ্পভরা বল্লরীতে দোলা দিয়ে, পল্লবভরা শাখায় কাঁপন লাগিয়ে আপন মনে গোপন বাণী গুঞ্জন ক'রে যাচ্ছে। আকাশের স্বচ্ছ নীলিমায় কলঙ্ক-রেখার মত অতিদূরে দু' একটি শঙ্খচিল আলোর ঝলকে কেঁপে উঠছে। দিনটা যেন রঙীনদেহ কম্পিতপক্ষ

মদিরগুঞ্জন-রত ভ্রমরের মত বনে বনান্তে আপনার মূর্চ্ছনার আবেশে উদাস হ'য়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

আলোর প্রণয়ে পাগল প্রকৃতির রূপের লীলায় আকৃষ্ট হ'য়ে শিপ্রা সন্দীপ খানিক নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। সন্দীপ অতি আদরে শিপ্রাকে জড়িয়ে ধ'রে আরো কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লে, "জীবনটা কি আলোয় ভরা শিপ্রা!"

তার সুন্দর কেশে জ্যোৎস্নাধারার মত আঙুলগুলি একবার ছুঁইয়ে উদাস সুরে শিপ্রা বল্‌লে, "কি জানি, আলোর পাশেই ত আঁধারের আভাস।"

সন্দীপ কোমল স্বরে বল্‌ল, "কিন্তু অনাগত আঁধারের উদ্দেশে আগত আলোককে উৎসর্গ করার সার্থকতা ত নেই কিছু।"

প্রকৃতির এই উদাস সৌন্দর্য্যের সন্ধানে সন্দীপ আজ একেবারে পুলকে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল। তার কৈশোরের একটুখানি স্মৃতির পরশ-লাগা এই স্থানটি এতদিন তার যৌবন-জীবনের কল্পলোকে কুহেলিকা-গড়া অনেক মায়া-স্বপন রচেছে, ভেঙেছে। আজ পুনর্ব্বার শিপ্রাকে সাথে নিয়ে সেই স্থানটিতে আসতে পারায় তার উৎসাহের অন্ত ছিল না, গর্ব্বও যেন খানিকটা ছিল। সামান্য এই পাহাড়টার এতখানি বর্ণনা যে সে করছিল শিপ্রার কাছে, মুগ্ধ হবার মত দৃশ্যও তাতে আছে অনেক।

শিপ্রা কিন্তু তার বিপরীত এক অকারণ অস্বস্তিতে অনিচ্ছা-

সত্ত্বেও ম্লান হ'য়ে পড়ছিল। এই পাহাড়, বনানীর নীরবতা, বাতাসের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস, আলো-আঁধারের আলপনা সবই তার কাছে অস্বাভাবিক, অনুদার, সৌন্দর্য্যবিহীন লাগছিল। মনে হ'চ্ছিল দিনটা যেন নিতান্তই রুক্ষ রিক্ত শূন্যতায় ঘুলিয়ে রয়েছে। অনাগত বিপদদূতের চঞ্চল চরণধ্বনি কি আগে হ'তেই শিপ্রার বুকে বেজেছিল ? কে জানে।

আরও খানিক উঠে এসে ক্রমে মন্দির দৃষ্টিগোচর হ'লো—পর্ব্বত-বক্ষে খানিকটা সমতল স্থান, কয়েকখানা নিরালা গৃহ পশুর আবাসে মানুষের নিদর্শন বজায় রেখেছে। শুষ্ক কদলী-পত্র, পরিত্যক্ত কীটদষ্ট ফলমূলে একটি স্থান ছেয়ে রয়েছে—সেখানে সদ্য হাট ভেঙেছে, মানুষের ভিড় ক'মে গেছে। একটা অস্বচ্ছ জলে-ভরা সরোবর ;—খানিকটা পাষাণ-আবৃত অঙ্গন-মাঝে অনতিবৃহৎ মন্দির।

পরিচ্ছন্ন দেখে একটা বৃহৎ প্রস্তরের ওপর ব'সে প'ড়ে শিপ্রা জুতা-মোজা খুলতে লাগ্ল। সন্দীপ বল্লে, "শীঘ্র নাও, ওপরের পাহাড়টা এখনও দেখতে বাকী! আমাদের ফিরতে দেরী হ'লে বেবী গোলমাল করবে হয়ত।"

শিপ্রা বল্লে, "খুব গিন্নী হ'য়েছ গো,—এখন এস মন্দিরে যাওয়া যাক।"

মন্দির দেখে বাহির হ'বার সময় শিপ্রার ভক্তির আতিশয্যে ও দর্শনীর মাত্রাধিক্যে পরম পরিতৃপ্ত পুরোহিত শিপ্রার গৌর ললাটে অতিরিক্ত বৃহৎ একটা সিঁদুরের টিপ এঁকে দিলে।

পরিত্যক্ত 'পাত্রবর্গের' মোজা পর্‌তে পর্‌তে সে নানা গল্প জমিয়ে তুল্লে পুরোহিতের সঙ্গে। বহুকাল আগে সেই কোন্ এক যুগে কে এক নাকি রাজা ছিল, তার ছিল দুই রাণী, রূপবতী ছোটরাণীর প্ররোচনায় বড়রাণীকে রাজা দিল নির্ব্বাসন—এই কামাখ্যার পাহাড়ে। মনের খেদে অতৃপ্ত বাসনা বুকে নিয়ে রাণী তার দীর্ঘকেশের ফাঁসি গলায় জড়িয়ে কর্‌লে আত্মহত্যা। সেই হ'তে কত দিন কত বর্ষ কত কাল ধ'রে এক অতৃপ্ত অশরীরী আত্মা এই পাহাড়ে-পর্ব্বতে ঘুরে বেড়ায়, সতেজ সুন্দর মানবকে সে ডাক দিয়ে ফেরে, কেউ স্পষ্ট জানে না, তবে কখন কখন নাকি অপার্থিব একটা আলো, অপরূপ কী এক ক্ষীণ ঝঙ্কার, অতি মদির তীব্র কি একগন্ধে বনস্থল দীপ্ত, ঝঙ্কৃত, আমোদিত হ'য়ে ওঠে,—এইটুকুতে তার আভাস মেলে। আর এ পাহাড়ে নাকি একটা ভয়াবহ জ্বালাও আছে। গৌরীর বিচ্ছেদে শোকোন্মত্ত শঙ্করের দারুণ ক্ষোভের একটা স্ফুলিঙ্গ বিষ্ণুর সুদর্শনে কর্ত্তিত গৌরী-অঙ্গের সঙ্গেই এই পর্ব্বতশিরে এসে পড়েছিল, সেই ক্ষোভ এর আকাশে বাতাসে মিলিয়ে আছে। কামাখ্যা এলে মানুষ ভেড়া হ'য়ে যায় ব'লে যে কিম্বদন্তী আছে তার সাথে এ-সবের একটা যোগসূত্র মেলে।

তিনজনে খানিক নির্ব্বাক হ'য়ে রইল। একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ছায়ায় বাতাস যেন ভারী হ'য়ে উঠছিল। জড়তা কাটিয়ে সন্দীপই সব আগে ডাক দিয়ে বল্‌লে, "নাও শিপ্রা, যত রাজ্যের

গাঁজাখুরি গল্প ত খুব শোনা হ'ল, এবার ওঠো। পুরোহিত মশায়ের কারণের ঘনঘটা আজ জমবে ভাল!—আগে হ'তেই বোধ হয় আমেজ এসেছে তাঁর।"

শিপ্রা অলস ভাবে বললে, "বেলা যে গেল।—ওপরে আর নাই বা গেলে। পুরোহিত বললে ওপরে নাকি বাঘের ভয়।"

সন্দীপ অধৈর্য্য হ'য়ে শিপ্রার হাত ধ'রে টানাটানি ক'রে বললে, "তুমি কি পাগল হ'লে শিপ্রা? পুরোহিতের কাছে সর্ব্বত্রই সর্ব্বপ্রকার ভয়। যত রাজ্যের ভূতুড়ে গল্পে তোমার বিশ্বাস হ'ল কবে থেকে? কত সাধাসাধি ক'রে এতদিন বাদে যদি বা এলে, অর্দ্ধেক দেখেই ফিরবে? তা কি হয়? ওপরে কত-কি দেখাব চল, ঐ যে প্রকাণ্ড গাছটা—ওর তলায় পাথরে শেওলা কেটে নাম লিখে গেছলাম সেবার, চল গিয়ে দেখি এখনও আছে কি না।"

সন্দীপের আগ্রহ দেখে শিপ্রার আর বাধা দিতে ইচ্ছা হ'ল না। দু'জনে ধীরে ধীরে উঠতে আরম্ভ করলে। দিনের প্রখরতা-ক্লান্ত আকাশ তখন সায়াহ্নের স্নিগ্ধতার আরতির সূচনা করছিল। দিগন্তে সূর্য্যের শতশিখার নৃত্যসভায় প্রদীপ নিভে আসছে। অরণ্যের অলস তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে ক্লান্তির গাঢ় নিদ্রার কালো ছায়া ঘনিয়ে উঠছে, ঊর্দ্ধে অরণ্য আরও গভীর হ'য়ে উঠেছে, চারিদিক এত নিস্তব্ধ-নিঃশব্দ—নিশ্বাস-গ্রহণেও যেন সঙ্কোচ লাগে। ভ্রূকুটিকুটিল অরণ্যনিবিড় ধ্যানগম্ভীর গিরিরাজ

শঙ্করের মত মহা-যোগাসনে সমাসীন,—নন্দীর হেমবেত্রতলে বিশ্বচরাচর যেন স্পন্দনহীন গতিহীন হ'য়ে প'ড়ে আছে। চারি-পার্শ্বের এই একান্ত নীরবতার ছোঁয়াচ বোধ হয় পথিক দু'জনার মনেও লেগেছিল, তারাও ভাষা হারিয়ে নীরবে চলেছিল। সহসা দু'জনেই চমকে উঠল অকারণে,—আরও কাছে স'রে এসে পরস্পরের হাতে হাত জড়িয়ে ধরল, নয়নে নয়ন বুলালো একবার।

সন্দীপ শিপ্রার নীরব অস্বস্তি মনে মনে অনুভব ক'রে তাকে সহজ ক'রে তোলার জন্য লঘুসুরের কথাবার্ত্তা আরম্ভ করল, "এত চুপচাপ কেন শিপ্রা, ভূতের ভয়টা মনে জাগছে বুঝি এখনও ?"

ঈষৎ হেসে শিপ্রা বললে, "ভূত নয় গো, ভূত নয়—পেত্নী।"

তাকে সস্নেহ-আলিঙ্গনে বেঁধে সন্দীপ বললে, "আমি অভয় দিচ্ছি,—মাভৈঃ!"

শিপ্রা কাছে স'রে এসে মৃদুকণ্ঠে ঊর্দ্ধমুখে সন্দীপের চোখের পানে তাকিয়ে বললে, "আমার ভয় কর্চ্ছে.. ..."

সন্দীপ তার সবল বাহু দিয়ে শিপ্রাকে চেপে ধরল, মুখে কিছু বললে না। পৃথিবীর সমস্ত বিপদ হ'তে শিপ্রাকে রক্ষা করতে পারে এই বাহু দুটি—সেইটাই সন্দীপ মৌন ভাষায় জানিয়ে দিলে। পরে বললে, "এ যাত্রায় তোমার বুঝি ঐ রূপকথাটাই সবার চেয়ে চিত্তাকর্ষক লাগল ?"

শিপ্রার মনে তখন কিসের একটা দ্বন্দ্ব বেধেছে সেই জানে।

সে বললে, "আচ্ছা নেপল্‌স্‌-এ থাকতে ভিসুভিয়াসে ওঠা তোমার মনে আছে ত ?—আমার মনে হয় এই পাহাড়টার সঙ্গে কোথায় তার একটা মিল আছে।"

সন্দীপ বললে, "অবাক করলে তুমি শিপ্রা! কোথায় সেই ভস্মের স্তূপ—অগ্নিময় ভিসুভিয়াস, আর কোথায় এই শ্যামলসুন্দর কামাখ্যা। তোমার কল্পনাশক্তি যে খুব প্রচণ্ড তাতে সন্দেহ করি না, নইলে তুমি এ দু'য়ে মিল দেখতে পাও ?"

চিন্তিতভাবে শিপ্রা বললে, "কি জানি—ঠিক ধরতে পারছি না। তবে ভিসুভিয়াস আর কামাখ্যা দুটোই সমান কদর্য্য এটা ঠিক।"

শিপ্রার উপমায় কল্পনাটা সত্যিই যে অতিরিক্ত দূর-বিস্তৃত হ'য়ে গেছল সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ ছিল না। ভিসুভিয়াসের সাগর-পারে সরলভাবে দাঁড়ানো রুক্ষ অপরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি—সবুজের শেষ চিহ্নটুকুও তার দেহ হ'তে মলিন হ'য়ে মুছে গেছে,—জ্বলন্ত তরবারির আঘাতে যেন ধরার শ্যামল অঞ্চল উন্মোচিত হ'য়ে গেছে সে দেহ হ'তে। প্রস্তরীভূত খণ্ড খণ্ড গন্ধকে আবৃত গাত্র, যেন আদিমকালের অতিকায় অস্পৃশ্য একটা কণ্টকদেহ কঙ্কাল! সহসা দেখলে মনে হয় শান্ত বুঝি, কিন্তু অতর্কিতে আগুনের বিদ্যুৎ অশুভ উচ্ছ্বাসে যখন বেরিয়ে এসে খানিকটা চূর্ণ প্রস্তর বর্ষণ ক'রে আকাশে মিলিয়ে যায়, তখন বোঝা যায় কত বড় অশান্ত ও, কী অনির্ব্বাণ অগ্নি ওর বুকে দিবারাত্রি ফণা মেলে গ'র্জ্জে উঠছে। তার সাথে কামাখ্যার এই শ্যামল বনানীর

কী সাদৃশ্য—ধরা কঠিন।.........তবু শিপ্রার আজ কেবলই মনে পড়ছিল সেই মক্ষি-গুঞ্জরিত কম্‌লাকানন পেরিয়ে "ক্লগ" রেলওয়ের গ্যালারি দেওয়া কাম্‌রায় বসে ভিস্যুভিয়াসের গা বেয়ে ওপরে ওঠা, গন্ধকের গন্ধমন্থর বাতাসে অস্বাচ্ছন্দ্যে নিশ্বাস নেওয়া, দগ্ধ লাভার ঝামা-ছড়ানো ধনভস্মের প্রলেপ-লাগানো অদ্রির ওপর দিয়ে ক্রেটারের কাছে রেলিংএ হেলে ভিস্যুভিয়াসের বুকের ধক্‌ধকানি শোনা;—উৎসাহের মাঝে কী আতঙ্ক সেদিনে। বিগত যুগের বিয়োগব্যথায় সে অদ্রির বুকের ছন্দ নাচে—কত সুন্দরের সমাপ্তি-বেলায়, কত মধুরের ধ্বংস-লীলায় বুকের সে আগুনের স্পন্দ বাজে। রুদ্র যেন র'য়ে র'য়ে অসহ্য রাগে অনল আঙুলে আপন বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে অগ্নিরক্তে রাঙা হ'য়ে উঠছে। শিপ্রার মনে হচ্ছিল সেই অমঙ্গলের রাজা অরণ্য-ঘন আবরণ-আড়ালে এখানেও কোথায় যেন বসে আছে—উপকথার রাক্ষসীর মত বিষাক্ত রসনা মেলে নির্ব্বাক অচপল হ'য়ে। ভিস্যুভিয়াসে যে উত্তেজনায় উন্মত্ত, উৎক্ষিপ্ত, পরি-স্ফুট,—এখানে সেই ভয়ঙ্কর এখনও আড়ম্বরে গম্ভীর, আয়োজনে অচঞ্চল। ভিস্যুভিয়াসে সে ক্রোধে পাগল হ'য়ে অগ্নিনৃত্যে অনল-শিখায় আত্মপ্রকাশ করছে, আর এখানে কামাখ্যায় সে-ই রুদ্র নির্ব্বিকার যাদুকররূপে তার অনিবার্য্য মায়াজাল গিরিদেহে বন-বনান্তরে বিস্তৃত ক'রে একান্ত নিশ্চলতার সবুজ ছদ্মবেশ প'রে অন্তরালে অপেক্ষা করছে—বনরাজির অন্তস্তল সেই সুদূর আগ্নেয়গিরির বুকের মতই রহস্যে আতঙ্কে আসন্ন হ'য়ে আছে।

পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবশেষে তারা উঠল এসে। সন্দীপ বললে, "যাক, অতিকষ্টে তোমায় টেনে আনা গেছে। কী সুন্দর নীচেটা দেখাচ্ছে চেয়ে দেখো! না এলে এমন দৃশ্যটি ত আর দেখা হ'ত না।" শিপ্রা মৃদু হাসলে শুধু। সন্দীপ বললে, "এ মন্দিরে ত কাউকে দেখ্‌ছি না। তুমি এখানে দাঁড়াও ত, আমি এগিয়ে একটু ডাক দিয়ে দেখি; না ব'লে ক'য়ে মন্দিরে ঢুকলে যদি চোর বলে শেষে?"

শিপ্রা সামনের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আকাশে অরণ্যে যেন সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ ব'য়ে যাচ্ছে। নিম্নে পাহাড়ের পাদমূলে গৌহাটি যাবার পথখানি শুকনো পাতার রাশ ঠেলে এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে। পথের পাশে এক এক স্থানে ভীমমূর্ত্তি কিরাতের দল কদাকার শূকরের পাল চরাচ্ছে, দূর হ'তে তাদের কর্দ্দম পুত্তলির মত ক্ষুদ্র অথচ বিকট দেখাচ্ছে। দূরে গৌহাটি সহর সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছায়ার স্বপ্নমায়ায় সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। চারিপাশের শ্যামলতার সাগর-মাঝে গৃহের চিহ্ন শিল্পীর তুলির টানের মত এখানে ওখানে লেগে আছে। আর এক পাশে ব্রহ্মপুত্র শেষবর্ষার আবেগভরা উচ্ছ্বাসে সূর্য্যাস্তে রাঙা হ'য়ে নৃত্যতালে চলেছে,—দূর হ'তে তার তরঙ্গচাঞ্চল্য অস্পষ্ট হ'য়ে অপ্রগল্‌ভ দেহখানি দেখা যাচ্ছে শুধু।

সন্দীপ তাকিয়ে দেখলে কী মৌন চারিদিক! মন্দিরের দরজা শিকল দিয়ে বন্ধ, কেউ কোথাও নেই। একবার শিপ্রার পানে তাকিয়ে সন্দীপ গাছের অন্তরালে এগিয়ে গেল; শীতের

দিনে সিক্ত বসনাবৃত দেহে শীতল হাওয়া যেমন শিহরণ ছড়িয়ে দিয়ে যায়, সহসা একটা অতি মৃদু সুর অচঞ্চল অরণ্যের বুকে তেমনি ঈষৎ শিহরণ তুলে ভেসে এল বহুদূর দুরান্তর হ'তে,—'আয়, আয়, চ'লে আয়।'

সন্দীপ চমকিত চক্ষু মেলে ঝাপ্‌সা বনের অন্ধকার অন্তরে তাকালে···কে ডাকে অমন ক'রে?···এত নেশা কোথা হ'তে এসে পলকে তাকে জড়িয়ে ধরল!···এ কি সেই চিরন্তন সুর, যে সুরে ঊষা দিবসকে ডাক দিয়ে যায়, 'আয়, আয়, আয়'!···যে সুরে গ্রহ উপগ্রহকে ডাকে, মহাসাগর তটিনীকে ডাকে, 'আয়, আয়, আয়!'···ওরে, সে কি এতদিন এই ডাকের অপেক্ষাতেই ঘুরে মরছিল?···এই ডাকেই তার জীবনতরু ফুল্ল হ'ল? উদাস আকাশ কি এই সুরে অলস মধ্যাহ্নকে ডাক দিয়ে বলে, 'নীলাগলানো সুধা নিবি আয়!'···ওরে, আর কি বন্ধনে থাকা যায়?···এই রহস্যময় সুরেই অসীম যে যুগে যুগে মানবকে কবি করেছে, কর্ম্মী করেছে, সন্ন্যাসীর সাজে বাহির ক'রে নিয়ে গেছে!...কী তন্দ্রায় এতদিন তার চিত্ত ডুবে ছিল রে! নিত্যকার সীমাবন্ধনের মাঝে যে অসীমের ডাক বার বার আঘাত জানিয়ে গেছে, 'জাগো, জাগো,' তবু সন্দীপ ত জাগে নি, শুধু স্বপ্নই দেখেছে।···ওরে, এইবার ঐ ডাক শুনে তার পায়ের বেড়ী, হাতের শিকল ঝন্‌ঝন্ ক'রে খুলল্ রে! এতদিনে কি তার আত্মা জেগেছে, চিত্ত কি তাই সাড়া দিয়ে বলে, বুঝি সময় হ'ল...।

সন্দীপের মনে হল, কালের মালা হ'তে এই অপার্থিব অপূর্ব মুহূর্ত্তটি হঠাৎ যেন খ'সে পড়ল বিকীর্ণ-জ্যোতিঃ মণির মত; আবেষ্টন নেই, বন্ধন নেই, যুগযুগান্তরের পুঞ্জিত সৌন্দর্য্য শুধু মহাশূন্যে উল্কাপ্রদীপের মত উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্ছে, এখনি নিভে যাবে নিঃশেষে হয় ত। আনন্দ-লোকের নিশানার এই ত ইসারা জানায়।...এবার তবে ঐ অনাস্বাদিত আনন্দের লেলিহান বহ্নিমাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়া যাক...। সৃষ্টিবিধ্বংসী এক প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তের আলোড়নে সন্দীপের সমস্ত অতীত চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে কোথায় ধ্ব'সে পড়ল, বর্ত্তমান কোন্ মহা নিষ্ফলতায় ভেসে গেল,—ভবিষ্যতের রঙীন আকাশ ঘনতিমির প্রলেপে কোথায় অবলুপ্ত হ'য়ে গেল। দানবীয় একটা আকর্ষণ শক্তি তাকে প্রবল পরাক্রমে টেনে নিয়ে অরণ্য-মাঝে উদ্দামগতিতে কোথায় মিলিয়ে গেল,—তার চিহ্নের লেশটুকুও অবশিষ্ট রইল না। আফ্রিকার মাংসভোজী উদ্ভিদের মত জীবন্ত মানবকে গ্রাস ক'রে বিপুল অরণ্য আবার স্থির শান্ত অনুচ্ছ্বাসময় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শিপ্রা অনেকক্ষণ আনমনে দাঁড়িয়ে ছিল, দেরী দেখে তার চমক ভাঙ্ল। ফিরে তাকিয়ে সন্দীপকে দেখতে পেলে না। সে উদ্বেগে অধীর হ'য়ে দ্রুত মন্দিরের দিকে ছুটে গেল, চারিদিকে তাকিয়ে দেখল—কোথায় সন্দীপ...? এই আসন্ন অমঙ্গলের আভাসেই আকুল অন্তর বুঝি তার বারম্বার চমকে উঠেছিল! ব্যগ্রব্যাকুল কণ্ঠে সে ডেকে উঠল, "ওগো, কোথায় গেলে,

কোথায় তুমি ?” পর্ব্বতে কন্দরে সে ধ্বনির কানাকানি উঠল শুধু—‘কোথায় তুমি, কোথায় তুমি ?’

*   *   *   *   *

২

নৃত্যপুলক-গীতিমুখর প্রশস্ত গঙ্গার পারে একখানি শুভ্র দ্বিতল গৃহ। ভাঙনের টানে গঙ্গা ক্রমেই এগিয়ে এসে উদ্যানের সীমাদেশ ছুঁয়ে যাচ্ছে। তারই তটপ্রান্তে উদ্যান-মাঝে উন্নত ঝাউ আর অস্থুল শুপারী গাছের তলে বেত্রাসন পাতা রয়েছে। পদ্মের পাপড়ির মত পঞ্চমীর ক্ষুদ্র এক টুকরো চাঁদ কুণ্ঠিত চরণে ঝাউগাছের ঝির ঝিরে পাতার ফাঁক দিয়ে ভীরু নয়নে তাকিয়ে আছে। তার মৃদু চুম্বনে নদী তরঙ্গ ঝক্‌মক্ করছে,—গৃহখানি ও পুষ্পতরুগুলি তার রূপালি স্নেহে সুন্দর হ’য়ে উঠেছে। বেত্রাসন ’পরে একজন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ হেলে ব’সে হস্তস্থিত সিগারে এক একবার টান দিচ্ছেন। তাঁর পাশে পুরু ঘাসের উপর রঙীন শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে ব’সে এক তম্বঙ্গী তরুণী সেতারে মৃদু মৃদু ঝঙ্কার দিচ্ছে। বৃদ্ধ তার পানে স্নিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে ছিলেন, কিন্তু মন তাঁর অজানা কোন্ লোকে উধাও হ’য়ে গেছে, কে জানে।

মাঝপথে সেতার সহসা থেমে গেল। বৃদ্ধ বললেন, “থামলে যে” ?

"তরুণী বললে, "ভুল হ'য়ে গেল যে দাছু,—তুমি কিছু শুনছ না!"

"শুনছি না কিরে? এমন জলজ্যান্ত ব'সে কাঠের মত নির্বাক বিস্ময়ে শুন্‌ছি, তবু তোমার শোনা হ'ল না?"

"সেতার শুনে বুঝি তুমি কাঠ হ'য়ে গেলে দাছু! তুমি নেহাৎ বেরসিক। কোথায় গদগদ-চিত্তে বলবে, 'মৌন ভাঙি গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর,' তা নয়, কাঠ হ'য়ে গেলে। থাকত যদি ওমর খৈয়াম!"

"তোমার ওমর খৈয়ামই ত বৃদ্ধরাজ্য হ'তে সব কবিত্ব লুটে নিয়ে একচেটে ক'রে রেখেছে; আমার জন্যে বাকী রেখেছে কিছু?"

. . "তা হ'লে আমার এই বেরসিক দাছুটিকে দেখছি বয়কট করতে হ'ল।"

"তরুণী-রাজ্য হ'তে বুড়োরা অনেকদিনই ত বয়কট হ'য়েছে ভাই! তোমাদের স্তাবকতা করতে খৈয়ামের নবীন এডিসন অনেক মিলবে।"

খঞ্জনয়নের চঞ্চল কটাক্ষ হেনে তরুণী লঘু হাস্যসহ বললে, "আহা, তা হ'লে আমার দাছুর একটি প্রবীণা প্রণয়িনীর অভিযানে আমাকে এখনই যেতে হয়!"

বৃদ্ধ সিগারটায় শেষটান দিয়ে যেন গভীর হতাশ-ভরে ফেলে দিয়ে বললেন, "সে আশাও নেই দিদি! সেই রাজপুত্রীর গল্প জান ত?—প্রথম বয়সে বিয়ের জন্য কত রাজপুত্র তাঁর দুয়ারে

লুটালে, তিনি হেঁকে বললেন, 'দেবপুত্র চাই।' আর একটু বয়স হ'ল, রাজপুত্র আর আসে না; মন্ত্রীপুত্র ধন্না দেয়, তখন রাজকুমারী বল্লেন, 'আচ্ছা, রাজপুত্র হ'লেও চলবে।' শেষে রাজপুত্রীর কালো কেশে যখন শারদ মেঘের শুভ্র ছায়া পড়তে সুরু হ'ল, তখন মন্ত্রীপুত্র ত কোন্ ছার, কোটালপুত্রের দল ও ধন্না দিয়ে ফিরে গেছে। রাজপুত্রী কিন্তু বলছেন 'কোটালপুত্র হ'লেও চলবে।' এমনি ক'রে তাঁর আর বিয়ে করা হ'ল না। আমাদেরও সেই দশা!—প্রবীণারাও ঘেঁসতে চান না।

"আহা অত হতাশ হ'য়োনা দাদু!"

তাঁর কাশ শুভ্র হাসি হেসে বৃদ্ধ বললেন, "হতাশ হব কিরে, প্রণয়িনীর গভীর আহ্বান আমি যে এবার স্পষ্ট ক'রে শুনতে পাচ্ছি; তাই ত আবার বহুকালের ভুলে যাওয়া কথাগুলো তোর উপর দিয়ে ঝালিয়ে নিচ্ছি,—বুঝতে পারিস না?"

"আহা দাদু, তাই বল। তোমার পাকাচুল তাই বুঝি দিন দিন এত শ্রী ধারণ কর্চ্ছে? আর তাই বুঝি কাল খবরের কাগজে চুলের কলপের বিজ্ঞাপনটার ওপর অত ক'রে চোখ দিচ্ছিলে? ভয় নেই, তোমার বিরহিণী নিশ্চয় কোন মণিহর্ম্ম্যে একাকিনী অশ্রু ঝরাচ্ছেন! তোমার যদি আর ধৈর্য্য না থাকে ত তাঁর সন্ধানে না হয় অভিযান আরম্ভ কর না?"

"অভিযানের দেরী নেই আর। আপাততঃ তুমি যার জন্যে দেহলীদত্তপুষ্পা হ'য়ে আছ তাঁর শুভাগমন হ'লেই, আমি আস্তে আস্তে বোঁচকা বুঁচকি বেঁধে আমার সেই ওপারের প্রণয়িনীর

উদ্দেশ্তে মহাযাত্রা করব,—কলপের আর দরকার হবে না, সে দেশে যে জরা নেই!"

"দাদু—"

গভীর অনুযোগভরা ছলছল নেত্রে তরুণী বৃদ্ধের পানে তাকালে। বৃদ্ধ তার দিকে হস্ত প্রসারিত ক'রে অতি স্নিগ্ধ কোমলস্বরে বললেন, "স'রে আয় শুক্লা!"

সেতারটাকে তৃণশয্যায় শায়িত ক'রে শুক্লা স'রে যেয়ে বৃদ্ধের জানুর ওপর মুখ রেখে পায়ের তলে বসল। তিনি গভীর স্নেহে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। বৃদ্ধের অতীত-জীবনের লুপ্ত ইতিহাস সুপ্ত অন্তরের মুক্তদ্বার পথে আবার যেন প্রকাশ পেল। তাঁর একমাত্র পুত্র সন্দীপের অস্বাভাবিক তিরোধানে তিনি হতাশ না হ'য়ে অদম্য উদ্যমে, একান্ত প্রচেষ্টায় ও অজস্র অর্থব্যয়ে তাকে ফিরে পাবার আশা করলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে সন্দীপের লেশ মাত্র সন্ধানও শোনাল না, শোনাল কতকগুলি আষাঢ়ে গল্প। শিপ্রার পানে চেয়ে বৃদ্ধকে শোক সংযত ক'রে দাঁড়াতে হ'ল, কিন্তু সন্দীপের তিরোধানের পর থেকে শিপ্রার মুখে কেউ আর হাসি দেখেনি। সে যেন নিশান্তের মিলন-বাসরের ঝ'রে পড়া ফুলদাম,—দীপান্বিতা রাত্রি-শেষের ক্ষীণ-জ্যোতিঃ প্রদীপের মত। বৃদ্ধ জানতেন সংসারের কোন বাধাই তাকে আর ধরে রাখতে পারবে না, শুক্লাও নয়। তাই একদিন সূর্য্যাস্ত-রঙীন আকাশের তলে শিপ্রার চিতা-অগ্নি যখন ধীরে ধীরে নিভে গেল, বৃদ্ধ গভীর শোকের মাঝেও একটা পরিত্রাণের

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, ভাবলেন, হতভাগিনী জুড়িয়ে গেল! তারপর অষ্টাদশবর্ষ কেটে গেছে, শুক্লা বেড়ে উঠেছে তার মায়েরই প্রতিমূর্ত্তির মত,—উপলচুম্বিত ঝর্ণাধারার মত অকুণ্ঠ স্বরলহরী ও বাদল দিনের কাজল মেঘের আঁধারে রচা চোখ দিয়ে বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেবার জন্য।······আজ সকালের ডাকে কে একজন পুরানো পরিচিত বন্ধু যেন সংবাদ দিয়েছে সন্দীপকে নাকি পাওয়া গেছে······সে নাকি যেখানে অন্তর্হিত হয়েছিল সেই খানেই ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে। এমন সন্ধান ত কতবারই এসেছে। কত নিদ্রাহারা রজনী, কত কর্ম্মভোলা দিন যে এমনি আশায় কেটেছে! বাতাসের নিশ্বাসে বাইরে ছুটে আসা, চ্যুত পত্রের পতনে চম্‌কে কেঁপে ওঠা···তবু সে ত আসেনি। তথাপি থেকে থেকে বৃদ্ধের মনে হ'চ্ছিল যদি আবার সন্দীপ সত্য সত্যই ফিরে আসে? যখন সময় ছিল, যখন এলে ঘরে মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠত, বুকের রক্ত আনন্দে নাচত, তখন সে ত আসেনি! আজ সে যদি আসে স্মৃতির শ্মশানে, যেখানে তার জীবনের সম্পদ্ নেই, কামনার ধন নেই, শুধু নদীতীরে একটি স্তম্ভের নীচে একমুঠা ভস্ম প'ড়ে আছে!···ওরে, আজ যে শিপ্রা নেই!···

লাল কাঁকর-ঢালা পথে কার শুভ্রবেশের আভাস সহসা দেখা দিল। বৃক্ষের ছায়া-আলিঙ্গন হ'তে মুক্ত হ'য়ে পথখানি যেখানে বেঁকেছে, সেখানে এসে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় আগন্তুকের অবয়ব স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। বৃদ্ধ চকিত নয়নে তার দিকে তাকালেন,—ওই গর্ব্বিত ভঙ্গীর পদক্ষেপ, ওযে তাঁর রক্তের সাথে চেনা!

সন্দীপ সোজা এসে বৃদ্ধের সম্মুখে দাঁড়াল। মৌন বিস্ময়ে তাঁকে দেখে বললে, 'তুমি !...এত বুড়ো হ'য়ে গেছ !'

বৃদ্ধ ভীতি বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখলেন অষ্টাদশ বর্ষের জরাভার তাঁর পুত্রের কেশাগ্রটুকুও স্পর্শ করেনি। কোন্ রুদ্ধজরা ঘুমপুরীর দেশ হ'তে ফিরে এল এ! বহুদিবসের নিরুদ্ধ অশ্রুজল আজ বৃদ্ধের আর বাধা মানল না; দুই হাতে বুক চেপে ধ'রে তিনি ভগ্নকণ্ঠে ডাকলেন, "সন্দীপ, সন্দীপ..." তারপর মূর্চ্ছিতের মত মাটিতে ব'সে পড়লেন।

সহসা শুক্লাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে সন্দীপ এগিয়ে যেয়ে গাঢ় স্নেহে তার হাত ধ'রে ডাকলে—'শিপ্রা !'...কিন্তু এ ত শিপ্রা নয়, অথচ তারই মত! সন্দীপের মনে হ'ল, এ কী প্রহেলিকা-মাঝে ভগবান তাকে ফেলেছেন! শিপ্রা যে ছিল আলো,...এ যেন এখনও আভা; শিপ্রা ছিল বসন্তের মদির চুম্বনে বৃক্ষদ্বার মুক্ত ক'রে সহসা-বিকশিত কুসুম মঞ্জরী,—আর এ যেন আজিও বৃক্ষের বক্ষের নিহিত কামনা। সন্দীপ অধীর কণ্ঠে ডাকলে, "শিপ্রা কোথায় গেল ?...এ কে ?"

শুক্লা এতক্ষণ বিপুল বিস্ময়ে, উদ্বেগে, ভয়ে থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল; বৃদ্ধের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "দাদু, দাদু, এ সব কি !"

বৃদ্ধ আস্তে আস্তে উঠলেন, আস্তে আস্তে বিমূঢ়তার পাশ হ'তে মনটাকে সবলে মুক্ত করলেন, তারপর মৃদু গম্ভীর স্বরে বললেন, "সন্দীপ, আজ হ'তে আঠারো বছর আগে তুমি জঙ্গলের

ভিতর হারিয়ে গেছলে।...এ শুক্লা, তখন ছিল শিশু, আজ বড় হ'য়েছে। শিপ্রা—নেই।..."

সহসা অন্তঃস্থিত অগ্নি-আবর্ত্তের ভয়াবহ আলোড়নে আগ্নেয়-গিরির মূল হ'তে গলিত লাভার রাশি যেমন শ্যামল শস্যপূর্ণ ভূমিকে এক মুহূর্ত্তে ভস্মরাশিতে পর্য্যবসিত করে, তেমনি একটা অন্তর্ভেদী ভীষণ আলোড়ন সন্দীপের সতেজ যৌবন-শ্রীকে মুহূর্ত্ত মধ্যে অবলুপ্ত ক'রে অষ্টাদশ বর্ষের নিরুদ্ধ জরার প্রস্রবণ যেন তার সকল অঙ্গে ছাপিয়ে দিলে।

সেই বিপুল ভারে তার উন্নত দেহ নুয়ে পড়ল, তার মুখ হ'তে রক্তের শেষ চিহ্ন মুছে গিয়ে মৃত্যু মলিন পাণ্ডুরতা ধারণ করল, পুঞ্জিত ক্ষোভে দুঃসহ নিস্ফলতার অগ্নিদাহে তার সকল দেহ যেন দগ্ধ হ'য়ে যেতে লাগল। অদৃষ্টের নির্ম্মম বিধানের ওপর তার চিত্ত বিদ্রোহী হ'ল, তার অস্থি পঞ্জর চূর্ণ ক'রে বিপুল দীর্ঘশ্বাস-সহ বেরিয়ে এল তার অন্তিম বাণী,—"এ কথা—মিথ্যা...মিথ্যা..."। পশ্চিম আকাশে হেলে পঞ্চমীর পাণ্ডুর চাঁদ তার দীর্ঘপ্রসারিত শুভ্র কর শিপ্রার ভস্মসমাধির 'পরে নির্দ্দেশ ক'রে তখন সন্দীপের অন্তিম অবিশ্বাসের মৌন প্রতিবাদ জানাচ্ছিল।

......তারপর বহুদিন গেছে। আজিও সেই গঙ্গার কোলে নিভৃত উদ্যানের মাঝে দমকা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে পঞ্চমীর রাত্রে সেই উদাস ঝাউ পত্র মর্ম্মরচ্ছন্দে এক একবার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যায়।

ননীলাল

১

অবিনাশ তাদের দলের নাম রেখেছিল লক্ষ্মীছাড়ার দল। মানুষের বেলা যা সচরাচর হয়ে থাকে, দেবতাদের বেলা বোধ হয় তার অন্যথা হবার জো নেই, তাই লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুই সপত্নীর মনোমালিন্য যাবার নয়। ওরা হল বাণীর ভক্ত, সপত্নীকাসেবী,—কমলা তাঁর কমল-আনন ফিরিয়ে নিয়েছেন ওদের দিক থেকে। কিন্তু তাই বলে ওরা দমে যাবার পাত্র মোটেই নয়; বরং এ নিয়ে একটু গৌরব অনুভব করে। শরীরটা অনশনে যে পরিমাণ লঘু হয়ে যায়, মনটাকেও ওরা সেই পরিমাণে হাল্কা ক'রে ফেলে। ওরা বলে আকাশে ওড়বার পক্ষে সোনার পাখার চেয়ে অ্যালুমিনিয়ামের পাখার সাহায্যটা হল বেশী। যাকে আমরা পাঁচজনে জানি জীবন যাত্রার সরঞ্জাম ব'লে, ওরা তাকে বলে ভার। এ ভার কমে কমে ওদের টুথ্ব্রাশে এসে ঠেকেছে। এখন সেটাকে পকেটে পুরে ওরা স্বচ্ছন্দে বাসা বদল করে বেড়ায়। কারণ, হাল্কা জিনিষের ভেসে বেড়ানই নিয়ম; কোন জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকা ওদের কুষ্ঠিতে লেখে নি। অবিনাশ হল এ দলের পাণ্ডা, মস্ত সাহিত্যিক। তার সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তায় আবহাওয়া

কথনো-কথনো মনস্থনের আকার ধারণ ক'রে অনেকগুলো সনাতন খোঁয়াড় উড়িয়ে নে যাবার প্রয়াস পেয়েছে ; তাতে ক'রে খোঁয়াড়-ওলাদের গালাগালি বর্ষিত হয়েছে ওর ওপর যাকে বলে কবির ভাষায় ঠিক্ 'শ্রাবণের ধারার মত।' বিষয়ী হবার মত এতটুকু বুদ্ধিও ভগবান্ ওকে দেন নি, বরং বিষয়কে যা নষ্ট করে, দিয়েছেন সেই প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধি। সেটি প্রমাণ হবে ওর জীবনের এক সামান্য ঘটনা থেকে। অবিনাশ যখন প্রথম শ্রেণীতে এম-এ পাশ করল, তার বাপ তাকে ধরে নিয়ে গেলেন এক মার্চ্চেণ্ট অফিসে। পুরানো দিনের মনিবদের সুপারিশে ছেলের জন্যে একটা চাকরী সেখানে প্রায় ঠিক হয়েই ছিল। অফিসে অবিনাশ, ম্যানেজার সাহেব ও তস্য বড়বাবুতে মিলে যে দৃশ্য-কাব্যটি রচিত হল, আমার এক নাট্যকার বন্ধুকে দিয়ে অনেক সাধ্য সাধনার পর সেটা এমনি ভাবে ড্রামাটাইজ্ ক'রে নিয়েছি ঃ

বড়বাবু। বিনাইন্ সার তোমাকে এগ্‌জামিন করতে চান।

অবিনাশ। হে মা ধরণি, তুমি দ্বিধা হও।

ম্যানেজার সাহেব। Read this (এই ব'লে তাঁর নিজের হাতের ড্রাফ্‌ট্ করা একটা চিঠি অবিনাশকে পড়তে দিলেন। অবিনাশ সেটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে গম্ভীর ভাবে সাহেবকে ফিরিয়ে দিল)।

বাড়বাবু। কই, পড়লে না ?

অবিনাশ। এমন কিছু মহাকাব্য তোমার বিনাইন্ সার

লেখেন নি যে জগৎসংসারকে তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে হবে। তা ছাড়া ঐ দশ লাইন লেখার মধ্যে তিনটে বানান ভুল।

বড়বাবু। বড় বড় সাহেব সুবোদের লেখায় ও রকম বানান ভুল হয়েই থাকে।

(ম্যানেজার সাহেব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বড়বাবুর দিকে তাকালেন। বড়বাবু তাঁকে ব্যাপারটা যতই বোঝাতে লাগলেন, ততই তাঁর মুখ চোখ লাল হ'তে লালতর হতে থাকল)।

বড়বাবু। তোমার ওপর বিনাইন্ সার বড় চটেছেন।

অবিনাশ। মূর্খ মাত্রেরই ঐ আর এক গুণ।

. বড়বাবু। এ রকম করলে তোমার চাকরি কি করে হবে বাপু? .

অবিনাশ। তা কি করতে হবে?

বড়বাবু। (আবার সাহেবের সঙ্গে খানিক পরামর্শ করে) বিনাইন্ সার বলছেন তুমি যদি তাঁর কাছে মাপ্ চাও তা হলে তিনি দয়া করলেও করতে পারেন।

অবিনাশ। (তার হাতের চেটোটি সাপের ফণার মত ক'রে বাঁকিয়ে) তোমার বিনাইন্ সারকে বক্ দেখাও।

ম্যানেজার সাহেব। (চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে) What's that! (স্তম্ভিত বড়বাবু যতক্ষণে সাহেবকে ওর মানে বোঝাবার ব্যর্থ প্রয়াস করেছেন,—ব্যর্থ প্রয়াস কারণ, ও

জিনিষটার ইংরেজি তারজমা হয় না,—ততক্ষণে অবিনাশের 'সবেগে প্রস্থান')।

সেই হ'তে অবিনাশ হল তার বাপের ত্যজ্য-পুত্তুর। ও কিন্তু বড়াই করে বলে বেড়ায় ওর বাপ ওকে জবরদস্তি ক'রে কেরাণী করতে গিয়েছিল বলে সেই রাগে ও বাপকে ত্যজ্য-পিতা ক'রে দিয়েছে।

অবিনাশ পর্ব্ব শেষ ক'রে এবার শিবারণের কথা বলা চলতে পারে। সে হল ওদের আর এক পাণ্ডা, আজকাল লিখছে গদ্য-কবিতা। দেখতে কবিতার মত কিন্তু ঠিক কবিতা নয়, মিল নেই। আমরা পাঁচজনে যাকে বলি ছন্দ, তাও নেই। ও বলে গদ্য-কবিতার একটা নিজস্ব ছন্দ আছে, শোনবার মত কান যাদের তাদের কানেই বাজে। ওর মতে মিল জিনিষটা আদিম সভ্যতার ক্রমবিকাশের অভিযানে প্রথম কৃত্রিমতার ধ্বজা, যেমন বস্ত্র। বস্ত্রের মধ্যে মানবের প্রথম পাপ ও প্রথম লজ্জার কাহিনী টানা-পোড়েনে বোনা আছে, তেমনি মিলের মধ্যেও। কবিতা হল রূপ, মিল হল তাকে আকর্ষণ করবার তন্ত্র, অর্থাৎ প্রসাধন। খাঁটি সোণার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে, তার ওপর এনামেল করলে তার আব্রু যায়। শকুন্তলার মৃণাল বাহুতে লীলা-কমলই সাজে, কনককঙ্কণ সাজে না। ক্রিটিকের দল কিন্তু রেগে বলে ওটা হল কবিয়ানার বার্দ্ধক্যের স্বেচ্ছাচার যেমন আওরংজীবের জিজিয়া কর। বৃদ্ধের পক্ষে হয়ত মার্জ্জনীয়, কিন্তু তরুণের পক্ষে নয়। রক্তের তেজ কমে এলে অশ্বপৃষ্ঠের

চেয়ে নরম পদি হয় লোভনীয়। তারই সঙ্গে তাল রেখে কাব্য-রচনার ব্যাপারে গম্ভ-কবিতাই কাব্য হয়ে পড়ে, কারণ তাতে মিল-ছন্দের ঝঞ্ঝাট যায় বেঁচে। সেই কারণে নিবারণের ক্রিটিকের দল ওটার নতুন একটা নামকরণ করেছে—'পম্ভ-গদিতা'।

নিবারণের মেশো জীবনে কথনো কাব্য-চর্চ্চা করেন নি, কারণ তাঁর ছিল মোটা মোটা টাকার সুদ-বন্ধকী কারবার। মেশোর ছেলে পুলে নেই। নিবারণকে বললেন, এস আমার কারবারে। নিবারণ তার জবাবে মেশোকে এক চার পৃষ্ঠার গম্ভ-কবিতা লিখে পাঠাল, তাতে অনেক রকম উচ্ছ্বাসের মাঝে মেশোর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি একটু সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। পড়ে মেশো নিবারণকে এমন একটা দারুণ অভিশাপ দিয়ে বসলেন যা ভাগ্যিস্ ফলে নি তাই, নইলে নিবারণকে আজ স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না।

এমনি আর এক পাণ্ডা হল ধনঞ্জয়। সে হচ্ছে ঔপন্যাসিক। তার কথা যথাস্থানেই বলা যাবে, তাকে নিয়েই ত গল্প। আরও কত যে আছে এই দলে, কেউ নাট্যকার, কেউ বা ভাস্কর, কেউ বা চিত্রকর, কত নাম করব।

সেদিন ভারি দুর্য্যোগ, কলকাতার রাস্তায় জলের স্রোত চলেছে। গভীর বর্ষায় বৈষ্ণব কবিদের নায়িকার 'মনে পড়ে সোদিনকি বাত।' বৈষ্ণব নায়িকার সঙ্গে কলকাতার এই এক বিষয়ের সাদৃশ্য দেখা যায়,—বর্ষার দিনে কলকাতা নগরী 'সো দিনকা' সুতানুটি হয়ে যায়। থেমে যায় তার মোটর

ট্রামের ঘর্ঘর, তার বিরামহীন কর্ম্মস্রোতের কোলাহল; কোন্ অদৃশ্য যাদুকরের মায়ামন্ত্রে নিমেষে ফিরে আসে তার অতীত দিনের পায়ে পায়ে হাঁটা, তার জল-থৈ-থৈ সুর।

অবিনাশ তার নীল খাতাটাতে এই কথাটা নোট করছে এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে এসে দাঁড়াল নরেন, সে হল চিত্রকর, তার 'বর্ষার কলকাতা' ছবিটার উপাদান সংগ্রহ হয়েছিল এই অপরাহ্নের অভিযানে। খানিক কথাবার্ত্তার পর নরেন বলল, 'ধনঞ্জয়টা একটা হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়াল শেষে।'

অবিনাশের কাণে কথাটা বেসুরো বাজল। বলল,—'তুমি ছবি আঁক, কথা ত গাঁথ না বন্ধু, তাই কোন্ কথায় কি প্রয়োগ তা জান না। ধনঞ্জয় একটু রোগা হয়ে গেছে বলতে পার, তাই বলে সে কি হেঁয়ালি হল?'

'তা জানি না বন্ধু কথার অত শত মার্ প্যাঁচ। সেদিন তার সঙ্গে দেখা, বল্‌লে ভাই কিছু ধার দিতে পার, দুদিন থেকে অনাহার। জান ত ইম্পিরিয়্যাল্ ব্যাঙ্কে চেক্ কাটবার অবস্থা আমার নয়, তবে সেদিন খোসামুদি করে পাঁচসিকায় আমার একটা ছবি বিক্রী করেছিলাম, তারই চার আনা দিলাম ধনঞ্জয়কে।'

অবিনাশ বলল, 'সাধু, বন্ধু, সাধু।'

'ধনঞ্জয়টা কি করলে জান? আমি একটু আড়াল হতেই দেখি সেই চার আনার সদ্ব্যবহার ক'রে টিকিট কিনে এমারল্ড্ সিনেমাতে ঢুকে পড়ল। উপোস ক'রে শুকিয়ে মরছে, তবু তার সিনেমা দেখা চাই, এ রকম মারাত্মক নেশা দেখেছ কি?'

অবিনাশ বলল, 'বটে, এ ত দস্তুর মত ভয়ের কথা দেখছি। হাঁ, হাঁ, এখন মনে পড়ছে বটে ধনঞ্জয়টাকে দুচারদিন আগে আমিও ঐ এম্পায়ার‍্ড্‌ সিনেমার দোরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি।'

নরেন বলল, 'পরে জানলুম আমিই তার একমাত্র মহাজন নয়। যার তার কাছ থেকে হো হো ক'রে যা তা ধার করছে আর সিনেমা দেখে ওড়াচ্ছে। ওর মাথা খারাপ হয়েছে নিশ্চয়।'

অবিনাশ বলল, 'ভেব না বন্ধু, আমি শীঘ্রই এর বিহিত করব।'

অবিনাশের মুখে নিবারণ সব শুনে বলল, 'চল একবার দেখি ব্যাপারটা কি। মনে হচ্ছে সিনেমার অশরীরী ছায়ামূর্তি ওর স্কন্ধে ভর করেছে। আমাদের উচিত একটু ওঝাগিরি করা।'

দুই বন্ধুতে মিলে ধনঞ্জয়ের বাসায় গিয়ে হাজির হল। পাঁচতলার বাড়ীর সব উপর তলায় একটি ছোট্ট পায়রার খোপের মত ঘর, বিমানহর্ম্মের কোন লক্ষণই তাতে নেই, অভ্রের লোধ্রের বদলে কাঠের পার্টিশান করা। সতরঞ্চিটাতে হাজার কালির ছাপ, তারই ওপর রাশি রাশি কাগজপত্তর বিছিয়ে শীর্ণ ধনঞ্জয় উদাস হয়ে বসে আছে। তার পায়ের তলায় একগাদা কিসের পাণ্ডুলিপি চেপে চট্‌কে গেছে।

অবিনাশ বলল, 'এই দুর্য্যোগে বিরহের আইডিয়াটা বোধ করি ঘনিয়ে উঠেছিল ভাল। তোমার চিন্তাধারার প্লাবনে ব্যাঘাত জন্মালাম বন্ধু।'

ধনঞ্জয় বলল, 'না, না, এস এস। সত্যি কথা বলতে কি

ভাই, তোমরা এলে তাই রক্ষে, তোমাদের কাছে আর লজ্জা কি, চার পাঁচ দিন একরকম অনাহারেই কাটছে। বিরহের চেয়ে আরো একটা বড় উপসর্গ যে আছে তা আজ অন্ত্রে অন্ত্রে অনুভব করছি।' এই ব'লে ও একেবারে সরাসরি হাত পাতল, 'তা তোমরা যদি কিছু ধার দিতে।'

নিবারণ ও অবিনাশ পরস্পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল।

নিবারণ বলল, 'মহা মুস্কিলের কথা বন্ধু, আমার হাতে এখন সিকি পয়সাও নেই। অবিনাশকে জিগেস্ কর। কেমন অবিনাশ?'

অবিনাশ বলল, 'খাঁটি সত্যি কথা। আমারও ঐ অবস্থা, কেমন নিবারণ?'

নিবারণ বলল 'খাঁটিতর সত্যি। তবে দ'মে যেও না বন্ধু, চল আমার বাসায়। ভোজ্য যা আছে, ভগ্ননিদ্র কুম্ভকর্ণের পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত না হলেও, আশা করি তোমার পক্ষে যথেষ্ট হবে।'

ধনঞ্জয় বলল, 'না ভাই, তার চেয়ে যদি অন্ততঃ চার আনাও ধার দিতে, খুব সুবিধে হত।'

অবিনাশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'কিছু মনে করনা বন্ধু, এর মধ্যে তোমার যে সূক্ষ্ম চালাকিটুকু আছে তা আর গোপন থাকছে না; রূপবাসীর কাছে ধান্যং ধনং ন চ স্বর্ণ ধনং। তোমার বেলায় তা হল উল্টা, মানে তোমার একটু কু-মৎলব আছে।'

ধনঞ্জয় থতমত খেয়ে বলল, 'কু-মৎলব? কই না! তোমাদের

বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি উপবাসী। দেখ দিকি আমার এই হাত,—একেবারে বাঁখারির মত সরু হয়ে গেছে।'—এই বলে তার শীর্ণ হাতখানা বার করে দেখাল।

নিবারণ ধমক দিয়ে বলল, 'অমন ক'রে আসল কথা চাপা দিও না। যা জিগ্‌গেস্ করছি তার জবাব দাও।'

অবিনাশ বলল, 'তুমি কথা গোপন কর্‌ছ। আমরা তোমার বন্ধু; অভয় দিচ্ছি, সমস্ত খুলে বল, তোমার বিরুদ্ধে চার্জ হচ্ছে ধার ক'রে সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছ। দোষী না নির্দোষ?'

ধনঞ্জয় হতাশ হয়ে বলল, 'সবই যখন জানতে পেরেছ তখন আর জিগ্‌গেস্ করে বৃথা কষ্ট পাচ্ছ কেন? তোমাদের এই উকিলি জেরা আমি গোড়া থেকেই অপছন্দ করছি।'

অবিনাশ বলল, 'অর্থাৎ দোষী। কত বন্ধুকে প্রতারণা করেছ, তোমার লজ্জা হয় না?'

ধনঞ্জয় রেগে বলল, 'প্রতারণা কি রকম! কোন্ কথাটা আমার মিথ্যে হল শুনি? উপবাসী আছি সেটা কি মিথ্যে? উপবাসী বলে ধার করি, সিনেমা দেখব বলে খরচ করি। সে আমার খুসী। আমি যদি না খাই, তোমাদের তাতে কি?'

অবিনাশ বলল, 'আমাদের আর কি, তোমার নিজেরই ক্ষতি। তোমার ভালর জন্যেই বলছি, কি বল নিবারণ?'

নিবারণ বলল, 'অবিশ্যি, অবিশ্যি। ধনঞ্জয়, তোমাকে ধমকাতে আসিনি।'

অবিনাশ বলল, 'আমরা তোমাকে স্নেহ দিয়ে বাঁচাতে চাই।

তোমার প্রতি আমাদের যে কী গভীর স্নেহ তা তুমি জান না, কি বল নিবারণ ?'

নিবারণ বলল, "স্নেহ ব'লে স্নেহ, 'রেখেছ বাঙালী করি, মানুষ করনি,'—সেই স্নেহ।"

অবিনাশ বলল, "সিনেমা-ষ্টার হবার মৎলব বুঝি ? তা তোমার অবগতির জন্যে বলা দরকার তোমার চেহারা ভ্যালে-ন্টিনোর চেয়ে সেই যে 'বিবাহে চলিলা বিলোচন' এর ছবি আছে তাকেই বেশী মনে করিয়ে দেয়।"

ধনঞ্জয় এবার দস্তরমত চটে বলল, 'চেহারার অত বর্ণনা তোমাকে কে করতে বলছে !'

নিবারণ বলল, 'তবে তোমার কল্পনার পুঁজি ফুরিয়েছে বুঝি, তাই সিনেমায় উপন্যাসের সস্তা প্লট্ খুঁজতে যাও।'

ধনঞ্জয় অভিমানের সুরে বলল, 'আমার প্রতিভাকে এমনি করে অপমান করতে তোমাদের বাধল না !'

অবিনাশ বলল, 'তবে সিনেমায়-সিনেমায় ঘুরে বেড়াও কিসের জন্যে ?'

ধনঞ্জয় বলল, "সিনেমায়-সিনেমায় ঘুরে বেড়াই কে বলল ? কেবল একটি ফিল্ম্ দেখি,—'নন্দরাণী'।"

অবিনাশ চোখ কপালে তুলে বলল, "এও শুনতে হল ! হে কর্ণ তুমি বধির হও ! ধনঞ্জয়, তোমার অত্যাধুনিক রুচির শেষে এই পরিণাম ! সেই 'নন্দরাণী,'—যা চিত্রজগতে বটতল—"

নিবারণ বলল,—'অর্থাৎ বটতলা—'

অবিনাশ ব'কে চলল, 'তুমি তাই দেখতে ছোট! তুমি পাগল হ'লে নাকি!'

নিবারণ বলল, 'পড়ছিলাম বটে নন্দরাণীর সমালোচনা। দুটো দৈত্য, কি বলে যে তাদের নাম,—একটার আবার মাথায় শিঙ্ গজিয়েছে,—তারা এল পুতনা রাক্ষসীর সঙ্গে। কৃষ্ণের মায়ায় দৈত্য দুটো গেল ঝপাৎ করে জলে পড়ে। সেখানে তারা কী কসরৎই দেখাল! একহাতে সাঁতার কাটছে আর এক হাতে ঢাল ঘোরাচ্ছে—'

অবিনাশ বলল, 'না ঘুরিয়ে উপায় নেই, কারণ ঢালটা হল কাগজের, জলে ভিজে যাবে যে।'

নিবারণ বলল, "সহসা আলোকের অক্ষরে ফুটে উঠল দৃশ্যপটের ওপর কবির জাজ্বল্যময়ী ভাষা—'তার পর গেছে কেটে কত শত যুগ'।"

অবিনাশ বলল, "না, না, 'ম্লান হয়ে গেছে কত উৎসুক উন্মুখ ভালবাসা'।"

নিবারণ বলতে লাগল, 'দৃশ্যপটের ওপর আবার কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, কত পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা হল উদ্‌ঘাটিত, তারপর চট্ করে ফুটে উঠল সেই ছবি, সেই যে দুটো দৈত্য সাঁতার কাটছিল তারা অনন্ত কাল ধরে সাঁতারই কাটছে—'

অবিনাশ বলল, 'এবং এতাবৎ কাল তারা অবিরাম ঢাল ঘুরিয়েই যাচ্ছে।' খানিক থেমে বলল, 'তা যাক্, কিন্তু ধনঞ্জয়, বিশ্বাস হয় না, তুমি কি ঠাট্টা করছ। সত্যি ক'রে বল দিকি—'

ধনঞ্জয় বলল, 'সত্যিই বলছি। আমি একেবারে অধঃপাতে গিয়েছি। ঐ নন্দরাণী আমি বোধ হয় পঁচিশবার দেখেছি, এখনও আশা মেটেনি। আমি যে কী কষ্টে আছি, কী ব্যথা যে এই বুকে বাজে, কী অস্থির যে হই, তা তোমরা ত বোঝ না কেউ, কেবল ঠাট্টা কর।'

নিবারণ গভীর সমবেদনার স্বরে বলল, 'খুব বুঝি বন্ধু, খুব বুঝি। তোমার কোনো ভয় নেই আমরা প্রাণপণে তোমার চিকিৎসা করব। ঐ যে ব্যথাটার কথা বললে ওটা কখন টের পাও,—রাত্রে না দিনে, খাবার পর না খাবার আগে? মাঝে মাঝে একটু স্মৃতিবিভ্রম হয়, না?—'

অবিনাশ বলল, 'আর ঐ সঙ্গে হজমের গোলমাল একটু একটু—'

ধনঞ্জয় জ্বলে উঠল, 'ও সব বাঁদুরে কথা রেখে দাও। শরীর আমার ভালই আছে। আমার কাছে আর তোমাদের ঘোড়ার ডাক্তারি করতে হবে না।'

অবিনাশ বলল, 'আহা চট কেন? যে লোক পঁচিশবার নন্দরাণী দেখেছে তার মাথা খারাপ হ'য়ে যাওয়া ছাড়া যে আর গত্যন্তর নেই বন্ধু!'

ধনঞ্জয় চটে বলল, 'আমি নন্দরাণী দেখতে যাই, কে বলল?'

অবিনাশ বলল, 'নাও, এবার স্মৃতি-বিভ্রম আরম্ভ হল।'

ধনঞ্জয় অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'আরে না, না। মানে নন্দরাণী ফিল্ম্ আমাকে আকর্ষণ করে না।'

অবিনাশ জিগ্‌গেস্‌ করল, 'তবে কে আকর্ষণ করে ?'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধনঞ্জয় বলল, 'ওরই ভেতর এক মেয়ে, সে যশোদার অভিনয় করেছে।'

অবিনাশ বলল, 'বল কি হে, তাকে দেখতে তুমি যাও ?'

ধনঞ্জয় বলল, 'হাঁ, তাকে দেখতেই ত যাই। আমি তন্ময় হয়ে কেবল তাকেই দেখি। কেন জান ? সে আমার হ'তে পারত, হল না, চলে গেল। শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো। তাই দেখতেই যাই।'

অবিনাশ চোখ কপালে তুলে ধীরে ধীরে বলল, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ ! এ যে প্রেম !'

নিবারণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'তাই বল সোনা, তাই বল। শুনে দেহে প্রাণ এল। তার সঙ্গে তোমার প্রেম হয়েছিল ? তাই তার ছবি দেখতে সিনেমায় যাও ? আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি উন্মাদ হয়ে গেছ। তা এতে ত পাগলামির কিছু নেই। বাঁচা গেল।'

অবিনাশ বলল, 'তা তোমার প্রিয়া কি এখন পরলোকে ?'

ধনঞ্জয় বলল, 'প্রায় তাই, মানে গোবরডাঙায়।'

অবিনাশ বলল, 'বেঁচে আছেন। তা সেই ভাগ্যবতী তরুণীর নামটি কি ?'

ধনঞ্জয় প্রবল উচ্ছ্বাস চেপে ধীরে বলল, 'তার নাম ?—তার নাম ননীলাল। জান, সে যখন হাসে তখন কমল-বনে কমল ফোটে ?'

অবিনাশ বলল, 'তা ফুটুক। কমল-বনে যত খুসী কমল ফুটুক আপত্তি নেই। কিন্তু ননীলাল! সে কি হে! নামটি ত ঠিক্ কমল ফোটার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখছে না। একটু যেন কেমন পৌরুষ ভাব রয়েছে মানতেই হবে।'

নিবারণ বলল, 'তুমি যা বোঝ না অবিনাশ তাতে কথা কয়ো না। ননীর মত কোমল আর কমলের মত লাল ইতি—শ্রীমতী ননীলাল। কি বল ধনঞ্জয়, এতে পৌরুষের কি আছে?'

ধনঞ্জয় সলজ্জে বলল, 'না, না, তার নাম ননী। আমি তাকে ইয়ে, মানে আদর করে ননীলাল বলে ডাকতাম।'

অবিনাশ বলল, 'আদর করে তাকে ননীলাল বলে ডাকতে? বেশ করতে।'

নিবারণ বলল, 'এখন ব্যাপারটা সমস্ত খুলে বল দিকি।'

ধনঞ্জয় ববল, 'সে ত এক লম্বা ইতিহাস।'

অবিনাশ বলল, 'তা হোক, তা হোক, আমরা সবটা শুনব।'

ধনঞ্জয় বলতে সুরু করল, 'আমি তখন নেবুতলার মেসে থাকি। তিন মাসের ভাড়া বাকি ছিল বলে এক রাতে ম্যানেজার বেটা আমায় বার করে দিল।'

অবিনাশ বলল, 'ম্যানেজার মাত্রেরই ঐ এক দোষ।'

ধনঞ্জয় বলতে লাগল, 'রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে দেখি হেদোর ধারে এসে পড়েছি। একটা বেঞ্চে শুয়ে পড়লাম, ভাবলাম রাতটা ওখানেই কাটান যাবে।'

নিবারণ বলল, 'আর ভাড়াও লাগবে না।'

ধনঞ্জয় বলে চলল, "কিছুক্ষণ যায়, এমন সময় দেখি পাশের বেঞ্চের কাছে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। আমায় দেখে ভয় পেয়ে চলে যাবার যোগাড় করছে দেখে আমি বললাম, 'যাবেন না, ভয় নেই। যার উপন্যাস বাংলার সকল মাসিক পত্রের প্রত্যাখ্যান-গৌরবে মণ্ডিত আমি সেই সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক ধনঞ্জয় চাটুর্য্যে।' শুনে মেয়েটি হাসল।"

অবিনাশ বলল, 'আর তখন কমল-বনে কি হল?'

ধনঞ্জয় গ্রাহ্য না করে বলে চলল, 'আমি বললাম আমার পরিচয় ত পেলেন, এখন আপনার পরিচয়টা? মেয়েটি বলল, তার নাম ননী, সে সম্প্রতি কলকাতায় এসেছে, কোন্ বাড়ীতে গভর্ণেসের কাজ করে। সে দিন তার ছুটি মিলেছিল একটু দেরিতে। তার বাসা হল শ্যামবাজারের ওদিকে, কিন্তু অত রাত্রে সে একলা যেতে সাহস করেনা, তাই সকাল হওয়া পর্য্যন্ত এই বেঞ্চে বসে কাটাবে ঠিক করেছে। শুনে আমি বললাম মাভৈঃ, আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসচি চলুন, কিন্তু মেয়েটি বলল, না থাক, এইখানেই বসি।'

অবিনাশ বলল, 'তোমার সরু ডিগ্‌ডিগে চেহারায় তোমাকে হারকিউলিস্ বলে ভুল করার সম্ভাবনা ছিল না, তাই মেয়েটির সাহস হয়নি।'

নিবারণ বলল, 'এ থেকে বোঝা যাচ্ছে মেয়েটির বেশ বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে।'

ধনঞ্জয় বলতে লাগল, 'খানিকক্ষণ তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে জানলাম সে আমারই মত দুঃখী।'

অবিনাশ জিগ্‌গেস করল, 'মানে, তার লেখা উপন্যাসও বাংলার সব মাসিকে প্রত্যাখ্যান করেছে না কি?'

ধনঞ্জয় বলল, 'না, না, মানে শৈশবে তার বাপ মরেছে, সৎমায়ের কাছে মানুষ। তারই গঞ্জনায় বাড়ী ছেড়ে এসেছে কলকাতায়, অন্নের সংস্থান করতে চাকরি নিয়েছে; কী তেজ!'

নিবারণ বলল, 'এই তেজ তাই হল লাল। অথচ রাত্রে ভয়ে একলা চলে না, তাই হল ননী। পুরো নামটি তাই ননীলাল। বলে যাও।'

ধনঞ্জয় বলতে লাগল, 'সকাল হলে মেয়েটিকে তার বাসায় পৌঁছে দিলাম। বিদায়ের কালে সে আমার দিকে চেয়ে হাসল, যেন শরতের সোনালি রোদ ভরানদীর ওপর টল্‌টলিয়ে পড়ল। চলে আসতে আমার পা ওঠে না, কি ছিল মেয়েটির চোখে। যাই হোক মেয়েটির কল্যাণে আমার সেদিন কিছু রোজগার হল। এক পব্‌লিশার আমার একটা উপন্যাস ছাপাবে-ছাপাবে করছিল। সেদিন তাকে না-ছোড়-বান্দা করে ধরলাম, সুইসাইডের ভয় পর্য্যন্ত দেখালাম, তাতে সে একশো টাকা দিয়ে পাণ্ডুলিপিখানা কিনল। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিল। বাকি পঞ্চাশ টাকা অবিশ্যি আজ অবধি দেয় নি। ভাঁড়াভাঁড়ি করছে। আমি তখনি গিয়ে মেয়েটিকে বললাম আপনার কল্যাণে আজ আমার কিছু লাভ হয়ে গেছে। ও গর্ভনেসি চাকরিটা কিছু নয়। আসুন আপনার

উপযুক্ত একটা চাকরির সন্ধান করিগে। তাকে ধরে নিয়ে গেলাম ঐ এমারল্ড্ কোম্পানীর ম্যানেজারের কাছে। বেটা আপ্‌কান্ট্রি ম্যান, সহজে কি আমল দেয় হে, কেবল বলে বেশথ্। ভেট প্রভৃতিতে আমার পঞ্চাশটি টাকাই খরচ হয়ে গেল, তখন মেয়েটিকে একটা ভূমিকা দিলে নন্দরাণী ফিল্‌মে। ননীলালের সে কী কৃতজ্ঞতা। আমি কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। আমার ননীলালের যে রকম প্রতিভা, তার পক্ষে এমারল্ড্ সিনেমা কিছুই নয়। অনেক খোঁজা খুঁজির পর আর এক সিনেমা ম্যানেজার ননীলালকে বেশী মাইনে দিতে রাজী হল। কথা দিল। নন্দরাণী ফিল্‌ম্ তৈরী হয়ে গেলে সে ও চাকরি ছেড়ে দিল। কিন্তু সেই নতুন ম্যানেজারটা আজ নয় কাল নয় করে অনেক ভাঁড়াভাঁড়ি করে শেষে পষ্ট জবাব দিয়ে বসল আর নতুন লোক নেবে না।'

অবিনাশ বলল, 'সে কি, তুমি বেটাকে আইনের ভয় দেখাও নি ?'

ধনঞ্জয় বলল, "দেখালাম ত, তা বেটা ভয় পেল কই! আমি বললাম, 'জান, তুমি আইন মতে তোমার চুক্তি রাখতে বাধ্য!' বেটা বলল, 'বেশ ত, বেশ ত, চুক্তি পত্রখানা নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা কর একদিন, তখন না হয় বিবেচনা করা যাবে!'—লেখা-লেখি ত ছিল না কিছু, কি আর করি বল। বেটা এমন জোচ্চোর তা কি আগে জানি হে! ননীলাল কাঁদতে কাঁদতে তার সৎমায়ের বাড়ী সেই গোবরডাঙ্গায় ফিরে গেল,—আমিই

ধরতে গেলে তার কারণ। আমার কথাতেই ত সে চাকরি ছেড়েছিল। সে যখন চলে গেল, তার কী কান্না, ওঃ—সে দৃশ্য দেখলে পেটেণ্ট ষ্টোন্‌ও গলে যেত।”

নিবারণ টপ্ করে তার চোখের জল পাঞ্জাবীর আস্তিনে মুছে ফেলল।

ধনঞ্জয় সুগভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “ননীলাল আমাকে ঠিক্ বিয়ে করত। কিন্তু ঐ ম্যানেজারটা কোথা হতে এসে আমার জীবনটাকে একেবারে মরুভূমি করে দিয়ে গেল। ও হো, হো, বেটা ‘দাগ দিয়েছে মর্ম্মে আমার গো, গভীর হৃদয় ক্ষত।’ এখন ননীলালের ছবি দেখে বেড়ান ছাড়া আর আমার কোন সান্ত্বনা নেই—” এই বলে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

অবিনাশ বলল, ‘সব বুঝেছি, আর বলতে হবে না; ধনঞ্জয় কেঁদ না, নিবারণ, সোজা হয়ে বস।’

নিবারণ তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বলল, ‘কান্নার সময় গিয়েছে। এখন চাই প্রতিহিংসা। এস বহ্নি, এস বিদ্যুৎ, কি বল অবিনাশ?’

অবিনাশ বলল, “আমিও ঐ কথাই বলি। ধনঞ্জয়, তোমার হৃৎপিণ্ডে গভীর ক্ষত, তুমি বলেছ ঠিক, বেটা ‘দাগ দিয়েছে মর্ম্মে তোমার গো!’ এর প্রতিশোধ নেব তবে আমাদের নাম। এই নাও আট গণ্ডা পয়সা। ক্ষুন্নিবারণের পক্ষে আশা করি এই যথেষ্ট হবে। ওঠ নিবারণ, এখনি পরামর্শ-সভা ডাকতে হবে। সময় নেই।”

এই বলে অবিনাশ ও নিবারণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পরামর্শ-সভা ডাকতে ছুটে গেল।

ওদের দলের নিয়মই এই, যা করতে হবে তড়িৎ ঘড়িৎই করা চাই। কাজেই দুঘণ্টার মধ্যে অবিনাশের ঘরে নব্য-সাহিত্যিকদের মস্ত এক সভা বসে গেল। সবায়ের মত্ হল সেই ম্যানেজারের কাছে লোক পাঠাতে হবে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যে। তখন হঠাৎ খেয়াল হল যে তাড়াতাড়িতে ম্যানেজারের নাম ঠিকানা ধনঞ্জয়ের কাছে জিগ্‌গেস করতে ভুল হয়ে গেছে। তখনই নিবারণ ছুটল ধনঞ্জয়ের বাসায়। খানিক পরে সে এসে খবর দিল ধনঞ্জয় সেই আট আনার সদ্ব্যবহার করে আবার নন্দরাণী দেখতে দৌড়েছে। অতি কষ্টে তার কাছ থেকে নাম ঠিকানা যোগাড় করা গেছে। সেই ম্যানেজার-কুল-কলঙ্কটার নাম গোবর্দ্ধন্ দোলুই।

তারপর দিন নিবারণ আর সুরেন বলে এক উদীয়মান ভাস্কর গেল গোবর্দ্ধন দোলুই-এর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। সুরেন বুদ্ধি ক'রে কার কাছ থেকে একটা পুরানো চাপ্‌কান্ ধার ক'রে এনে পরেছে, মাথায় এঁটেছে মস্ত কালো এক শাম্‌লা, যাতে তাকে উকিল-উকিল দেখায়। নিবারণ পরেছে গলাবন্ধ কোট আর কালো রঙের পাৎলুন, অভিসন্ধিটা যেন তাকে এ্যাটর্ণি বলে মনে হয়। আর ওরা সঙ্গে নিয়েছে এক চামড়ার হাতবাক্স, যেন ওর মধ্যে মাম্‌লার অনেক দলিল দস্তাবেজ আছে। এই রকম বেশভূষা ক'রে ওরা দুজনে দোলুই সন্দর্শনে

যাত্রা করল। অবিনাশ অবিশ্যি ওদের সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে, আর বার বার করে বলে দিয়েছে বেশ মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথাবার্ত্তা কইতে।

ম্যানেজার গোবর্দ্ধন দোলুই তখন কি একটা কাজে ব্যস্ত,—দুদিন বাদেই তার নতুন সিনেমা ঘর খুলবে,—ঠকাঠক্ আওয়াজ হচ্ছে চারিদিকে। তার চেহারা দেখে ওরা গেল দস্তুর মত ভড়কে। ভীষণ মোটা এবং বেঁটে, হাতীর মত মুখ, তাতে দুটো ছোট ছোট চোখ অত্যন্ত অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল। পুরু ঠোঁটের নীচে আতার বীচির মত কালো কালো দাঁত।

গোবর্দ্ধন ওদের দেখে বলল, 'কি হে ছোকরারা কি মনে ক'রে? চাঁদা-ফাঁদা যদি হয় ত সরে পড়। তোমাদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবার আমার ফুর্সৎ নেই।'

সুরেন যতদূর সম্ভব গম্ভীর হয়ে বলল, "শুনুন গোবর্দ্ধন বাবু, হাইকোর্টের সময় হয়ে আসছে, ফুর্সৎ আমাদেরও নেই। আমরা এসেছি শ্রীমতী ননীলালের Case-এ—"

গোবর্দ্ধন দোলুই হা হা ক'রে অট্টহাসি হেসে বলল, 'শ্রীমতী ননীলাল! বলি, তিনি হন কে?'

সুরেন চটে গিয়ে বলল, 'হাসবার কথা নয়। শ্রীমতী ননীকে আপনি আপনার সিনেমাতে নিযুক্ত করবেন বলে চুক্তি করেছিলেন কি না?'

ম্যানেজার আকাশ থেকে পড়ল—'আমি! কই না!'

নিবারণ বলল, 'ভুলে যাচ্ছেন মশাই; অত সহজে ভুললে

চল্‌বে না। আপনার সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল বলে আমাদের মক্কেল শ্রীমতী ননীলাল তাঁর আগের কাজে ইস্তাফা দেন। কিন্তু আপনি সে চুক্তি ভেঙেছেন। অতি ইতরতার সঙ্গে ভেঙেছেন। তাই নিয়ে একটা বোঝা পড়া করবার জন্তেই আমাদের এই কস্যওকালতনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, বুঝেছেন। এই কাজ ক'রে ক'রে চুল পাকালাম। সেদিন ঠিক্ এই নিয়েই ডিক্রুজ্‌ সাহেবের এজ্‌লাসে এক বেটার তিন মাস জেল দিইয়ে দিলাম। তা যাক্, আপনার নামে ক্ষতিপূরণের দাবী ক'রে নালিশ রুজু করবার instruction রয়েছে।'

গোবর্দ্ধন দোলুই আবার অট্টহাস্য ক'রে বলল, 'রয়েছে না কি! তা তোমার ডিক্রুজ সাহেব আমায় ফাঁসী দেবেন তা হলে! শুনে এই দেখ, আমি তোমাদের সামনে ভয়ে কাঁপছি,—ঠক্ ঠক্ ঠক্!' এই বলে ব্যঙ্গ ক'রে তার হাতীর মত শরীর কাঁপাতে লাগল।

সুরেন বলল, 'আপনি ত অতি ভয়ঙ্কর লোক মশাই! যদি সহজে কিছু না করেন তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদের আদালতে যেতে হবে। তাতে ফল আপনার ভাল হবে না। তার চেয়ে একটা আপোষে রফা ক'রে ফেলুন না কেন?'

নিবারণ বলল, 'তাই করুন বুঝলেন। কেন আর মিছিমিছি হাঙ্গাম করেন। আপনিও ভদ্রলোক আমরাও ভদ্রলোক, আপোষ ক'রে ফেলুন।'

গোবর্দ্ধন দোলুই বলল, 'আপোষটা করতে তোমাদের

দেখছি ভারি উৎসাহ যে হে! তাতেই বোঝা যাচ্ছে তোমরা উকিল-টুকিল কিস্যু নও, উকিলে কখনও আপোষ করে? তারা মামলা বাড়িয়েই দেয়। আর চুক্তি খেলাপ করলে বুঝি ফৌজদারী কেস্ হয়? কোন পুরুষে উকিল নও, উকিল সেজে আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী করতে এসেছ। দেব এখনি intimidationএর চার্জ্জে ফেলে।'

সুরেন চীৎকার করে বলল, 'এ তোমার মত ছোটলোকের উপযুক্ত কথাই বটে। ইচ্ছা করছে দুই ঘুসি মারি তোমার পিঠে।'

ম্যানেজার তাড়াতাড়ি পিছু হঠ্‌তে হঠ্‌তে বলল, 'হুঁঃ ডুটো ডোঁপো ছোঁড়া এসেছেন গোবর্দ্ধন দোলুইএর সঙ্গে চালাকি খেলতে। ওঁরা আবার উকিল, ওঁদের আবার মক্কেল, ওঁদের আবার হাইকোর্টের বেলা হচ্ছে। এই তোদের আর তোদের মক্কেলকে আমি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছি, যা কি করতে পারিস করগে যা—।'

নিবারণ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'দাও গোব্‌রা বেটাকে এই নর্দ্দামায় ডুবিয়ে!'

গোবর্দ্ধন দোলুই তাড়াতাড়ি তার কামরায় ঢুকে পড়ে বলল, 'বেরোও এখান থেকে, নইলে পুলিসে ফোন করব!' এই বলে দড়াম করে দরোজা বন্ধ করে দিল।

নিবারণ ও সুরেন ব্যর্থ ক্রোধে খুব খানিক হাত পা ছুঁড়ল। সুরেন বলল, 'জানো নিবারণ, একেই বলে লড়াই! ভ্রূকুটির

সহ গর্জন মিশে, রক্ত রক্ত শব্দে'—এই বলে দুম ক'রে দরোজায় ঘুসি মারল।

নিবারণ বলল, 'এই রইল আমাদের পণ, হয় ঐ গোবরা আমাদের ননীলালকে চাকরি দেবে, নয় ও আমরা ওর মুণ্ডপাত করব।'—এই বলে মাটিতে খুব জোরে পদাঘাত করল।

এম্‌নি খানিক চেঁচিয়ে ওদের উষ্মা একটু কমলে সুরেন নিবারণকে বলল, 'কিন্তু অবিনাশ আমাদের রাগারাগি করতে মানা ক'রে দিয়েছিল।

নিবারণ বলল, 'আমরা ত রাগ করিনি। কোথায় রাগ করেছি? রাগ করেছে ত ঐ গোবরা বেটা।'

সুরেন বলল, 'তা ঠিক্। আমরা কই রাগ করলাম! কিন্তু বিকেল হচ্ছে, আর আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু আস্ফালন করে কি হবে?'

নিবারণ বলল, 'বলেছ ঠিক্। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক্ নয়, শেষে আমরা সত্যি সত্যি রেগে যেতেও পারি। তা ছাড়া গোবরা বেটা পুলিস ডাকবে বলে শাসিয়ে গেছে। চল আমরা গুরুতর পরামর্শ সভা করিগে। যেমন করে পারি গোবরা বেটাকে বধ করতেই হবে, তাতে যত খরচ লাগে। আমার যদি সাম্রাজ্য থাকত সাম্রাজ্য দিতাম।'

সুরেন বলল, 'আমিও তাই। দরকার হলে আমার এই জুতো জোড়াটা পর্যন্ত বন্ধক রাখব তা বলে দিলাম।'

* * * *

এই ঘটনার ঠিক দুদিন পরে। গোবর্দ্ধন জোলুইয়ের নতুন সিনেমা ঘর সেদিন খুলেছে। সিনেমা সুরু হবার কিছু আগেই জন কুড়ি লোক হৈ হৈ ক'রে ঢুকে পড়ল। তারা সেই দারুণ গ্রীষ্মে পরে এসেছে গরম ওভারকোট, কেউ বা জড়িয়েছে গায়ে মোটা ভুটিয়া কম্বল, কারো গলায় মাফ্‌লার বাঁধা, কারো বা কণ্ঠে বেলেডোনার প্রলেপ। সিনেমা সুরু হল। খানিক এ ছবি সে ছবি দেখানর পর স্ক্রীনের ওপর কর্পোরেশনের নোটিশ উঠ্‌ল,—'ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও তাহার প্রতিকার'। বাংলায় ও ইংরাজিতে লেখা নোটিশ; ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা যে কী ভয়াবহ, কী ছোঁয়াচে এই সমস্ত সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ ক'রে নাগরিকদের সাবধান ক'রে দেওয়া হচ্ছে তাঁরা যেন ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে ঘর এবং সর্দ্দি-কাশি-গ্রস্ত লোকদের সমান ভাবেই পরিত্যাগ করেন। দর্শকরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়ছে, কারণ কল্‌কাতায় তখন খুব ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ, সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে আছে,—এমন সময় ঘরের কুড়ি দিক থেকে কুড়িটি ভীষণ হাঁচির আওয়াজ শোনা গেল। সে কী ভীষণ শব্দ,—মনে হল যেন কুড়িটি টায়ার একসঙ্গে ফেটে গেল। তারই সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল সে কি ঘন ঘন কাশি,—অবিরাম! কে একজন আর একজনকে খুব ভারি গলায় বল্‌ল, 'মশাই, এখানটা দেখছি ভারি স্যাঁৎসেঁতে, নয়? আমার ত ভীষণ সর্দ্দি হয়ে গেল!' অপর একজন ওদিকার কাকে বলল, 'কি ঠাড্‌ডাই লেগেছে মশাই, হো, হো, হো,—মাথা একেবারে নাড়াতে পাচ্ছিলা।'

এমনিতর কথাবার্ত্তার মৃদু গুঞ্জনে সিনেমা ঘর একেবারে মুখর হয়ে উঠল।

একজন প্রবীণা গিন্নী তাঁর স্বামী, তাঁর আড়াই ডজন পুত্রকন্যা, এক ডজন জামাতা ও প্রায় সেই সংখ্যক নাতি-নাত্‌নী নিয়ে স্ক্রীনের বাম দিকের একেবারে চার পাঁচটি রো জুড়ে বসেছিলেন। গিন্নীটি প্রথমে কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়লেন (স্ক্রীনে যা লেখা ফুটে ওঠে তা চেঁচিয়ে পড়াই হল অনেক দর্শকের অভ্যাস), তার পর হাঁচি কাশির আওয়াজ শুনলেন, আর ঐ যে গুঞ্জন উঠ্‌ল তারও কতক কতক কর্ণগোচর হল। চিরকাল কর্ত্তা এবং ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে তাঁর গৃহিণীসুলভ ইন্‌স্‌টিংকট্ খুবই পাকা হয়ে গিয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তারস্বরে সাবধান ক'রে দিতে লাগলেন,—'ওগো শুনছ, বলি ওদিকে হাঁ ক'রে কি দেখছ ?—তোমার গলাটা ঢাকো। অরে অ নবীন, তোর কোটের বোতামগুলো এঁটে দে বাবা। ও মঞ্জুরি, তোর কাঁধে হাওয়া লাগ্‌ছে না ত ? না বলিস্ কি বল ! আমি দেখতে পাচ্ছি হাওয়া লাগছে, আর তুই না বল্লেই হ'ল ! ও নিখিল, নিখিল, তোমার চাদরটা গলায় বেশ ক'রে জড়িয়ে নাও ত বাবা। ও কালীচরণ, তুমি আমার কাছে চলে এস ত দাদু, তোমার পাশে ঐ কম্বল-জড়ানো লোকটা কী ভীষণ হাঁচছে গো ! তা তুমি বাছা এই সর্ব্বনেশে হাঁচি কাশি নিয়ে কেন এখানে এসেছ বলত ! তোমার আক্কেল বলে কি জিনিষ নেই বাছা ! এত সর্দ্দি-কাশিতে মানুষ

বাইরে বার হয়। বাইস্কোপ ত আর পালিয়ে যাচ্ছিল না, না হয় ছদিন পরেই আস্‌তে'—এই বলে সেই কম্বল-জড়ানো সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকটিকে খুব খানিক বকুনি দিয়ে দিলেন। লোকটির চাপা গলার আওয়াজে সে ঠিক্ হাসছে কি কাশছে বোঝা গেল না। ওধারে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর পাঁচটি নাতি-নাতনীকে তেমনি ক'রে হেঁকে হেঁকে সাবধান করতে লাগলেন।

সিনেমা আর দেখবে কে? সবাই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার ছোঁয়াচ্ লাগার ভয়ে তটস্থ হয়ে রইল। এমনি খানিকক্ষণ কাট্‌বার পর, হাঁচি কাশি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে দেখে পূর্বোক্তা গিন্নীটি বললেন, 'ওগো শুনছ, ওঠো,—ছেলে মেয়েদের সব ডাকো, শিশিরকে গাড়ী নিয়ে আসতে বল, আর এখানে থাকা নয়।'

কর্ত্তা একটু মৃদু আপত্তি জানিয়ে বল্লেন, 'না, না, ও কিছু নয়।'

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, 'ও কিছু নয়! তোমার ঐ এক রকম কথা, ও কিছু নয়। শুনলে হাড় জ্বলে। শেষে একটা সর্দ্দি কাশি ক'রে বস।'

কর্ত্তা বলিলেন, 'আহা দেখই না খানিকটা বসে। রাগ কর কেন?'

গৃহিণী আর এক পর্দ্দা সুর চড়িয়ে বললেন, 'আমি অমন তোমার মতন অনেষ্য রাগ করি না। তা থাক তুমি এখানে বসে, বাইস্কোপ্ ত আর দেখনি কোন জন্মে! যা দেখেন

তাতেই মাথা ঘুরে পড়েন! বললুম নিয়ে চল ভাল একটা সিনেমায়, তা সেখানে না গিয়ে নিয়ে এলেন এই একটা হতভাগা বাইস্কোপে, মাগো মা, একেবারে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ভরা। কে এক গোব্‌রা দোলুই, তার আবার বাইস্কোপ। কাকের আবার প্যাখম! তুমি না যাও না যাবে, থাক এখানে বসে। আমি ছেলে মেয়েদের মেরে ফেলতে ত পারি না। অ নবীন, ও মঞ্জুরী, ও বাবা নিখিল, ও কালীচরণ—' এই বলে তিনি তাঁর সুবৃহৎ গোষ্ঠির প্রত্যেক পরিজনের নাম ধরে ডাকাডাকি আরম্ভ ক'রে দিলেন। তাদের সকলকে গুছিয়ে নিয়ে সশব্দে দরোজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য কর্ত্তাটিকে সেই জন-অরণ্যে একাকী ছেড়ে গেলেন না। ওদিকের সেই বৃদ্ধ অতি সাবধানী ভদ্রলোক ও তাঁর পাঁচটি নাতি-নাতনী সহ সুগৃহিণীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন। দেখতে দেখতে সিনেমা-ঘর প্রায় খালি হয়ে এল। সকলেরই ত প্রাণের ভয় আছে।

তার পরদিন আবার জন কুড়ি লোক অমনিধারা মুড়ি-সুড়ি দিয়ে ঐ সিনেমায় ঢুকে পড়ল। কর্পোরেশনের হুকুম প্রতি সিনেমাতেই বিজ্ঞাপনটি দেখাতে হবে। যেমন বিজ্ঞাপন উঠল, অমনি সমবেত হাঁচি। সেদিনও দর্শকরা সিনেমা ছেড়ে ক্রমে ক্রমে সরে পড়ল। গোবর্দ্ধন দোলুইএর টিকিটের দাম ফেরত দেওয়া উচিত এমনি ধারা কথা দু এক জন দর্শকের মুখ থেকে শোনা গেল। এম্‌নি রোজ চলতে লাগল।

এর ফলে ওপাড়ায় দোলুই মশায়ের সিনেমায় ভারি একটা

দুর্নাম রটে গেল। ঘরটা নাকি ভীষণ স্যাঁৎসেঁতে, যে যায় তারই ঠাণ্ডা লাগে। এটা ব্যবসার পক্ষে কম ক্ষতিকর নয়।

এক সপ্তাহ পরে সিনেমায় ভিড় এক রকম নেই বললেই হয়। সেদিনও জন কুড়ি লোক অমনিধারা গরম কাপড় মুড়ি দিয়ে যেমন ঢুকতে যাচ্ছে অমনি গোবর্দ্ধন দোলুই স্বয়ং এসে পথ আগলে দাঁড়াল। দোলুইএর হাতীর মত দেহ রাগে আরও ফুলে উঠেছে। ঘুসি পাকিয়ে বলল, 'পাজী বদমায়েস্ সব, চেন নি এখনো গোবর্দ্ধন দোলুইকে!'

নিবারণ, মানে ওটা হল নিবারণদেরই দল কি না,—সে বলল, 'বিলক্ষণ চিনি! অমন নবজলধরশ্যাম বপু, ও কি ভোলবার!'

দোলুই বলল, 'চালাকি করতে এসেছ আমার সিনেমায়!'

নিবারণ বলল, 'না, টিকিট কিনে তোমার সিনেমা দেখতে এসেছি। আমরা দর্শক।'

দোলুই বলল, 'দর্শক না গুষ্টির পিণ্ডী! এসেছ দল বেঁধে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ ক'রে হেঁচে আমার খদ্দের ভাগাতে।'

নিবারণ বলল, 'তা যদি আমাদের হাঁচি পায় হাঁচব না? এ ত ভারি জুলুম!'

দোলুই বলল, 'বোকা বোঝাতে এসেছ! হাঁচি পায়! কুড়ি জনের অম্নি এক সঙ্গে হাঁচি পায়। জানো, এর জন্যে তোমাদের সোজা শ্রীঘরে চালান ক'রে দিতে পারি!'

নিবারণ বলল, 'পার না কি! দেখ এই আমরা কাঁপ্‌ছি ভয়ে ঠক্ ঠক্ ঠক্—তুমি যেমন ক'রে কেঁপেছিলে।'—এই বলে

তারা কুড়ি জনেই দোলুইকে ঘিরে ঘন ঘন কাঁপতে লাগল। দোলুই এতে যা চটল তা আর কহতব্য নয়। বলল, 'তোমাদের সবাইকে পুলিসে দেব।'

নিবারণ বলল, 'চার্জ-টা কি?'

দোলুই বলল, 'জান না! সবাই যেন ন্যাকচন্দর!'

নিবারণ বলল, 'তোমার সিনেমায় বসে হাঁচি, এই ত চার্জ?'

দোলুই বলল, 'তা নয় ত কি! খদ্দের ভাগিয়ে ভাগিয়ে সিনেমা প্রায় উঠে যাবার জোগাড় হয়েছে, এটা কম চার্জ হল!'

নিবারণ বলল, 'মস্ত চার্জ! ফাঁসী হয়ে যাবে!' এই বলে তারা কুড়ি জন লোক হো হো করে হেসে উঠল। দোলুই তার নিজের নিক্ষিপ্ত শর তার নিজের প্রতি ফিরে আসছে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে রইল।

অবশেষে একেবারে হতাশ হয়ে বলল, 'তার চেয়ে একটা আপোষ—'

ওরা সবাই হল্লা করে বলে উঠল—'পথে এস দাদা।'

* * * * *

মহাসমারোহে ধনঞ্জয়ের সঙ্গে ননীলালের বিবাহ হয়ে গেল। নিমন্ত্রিতদের আদর অভ্যর্থনা করছিলেন গোবর্দ্ধন দোলুই স্বয়ং। বিবাহ-সভা বসেছিল তাঁরই সিনেমা-গৃহে। 'চিত্রজগৎ'এর মহা গণ্যমান্য সম্পাদক মশায় ভুরী-ভোজনে আপ্যায়িত হয়ে বললেন —'ইঃ, তিন শো তিপ্পান্নটি বক্তৃতা আর প্রায় সাড়ে চার হাজার

কবিতা পাঠ শুনে পায়ে ঝিন্‌ঝিনি ধরে গেছে মশায়, অনেকের হাই উঠেছে বটে কিন্তু কই কাকেও ত হাঁচতে শুনি নি। সিনেমা ঘরের ব্যবস্থাগুলো যা করেছেন মশাই, একেবারে চমৎকার। কালই লিখব আমি মস্ত একটা প্যারা। বোধ করি কোন নিন্দুকে এর বদনাম রটিয়ে থাকবে।'

তার পর গোবর্দ্ধন দোলুই-এর সিনেমার আর কোনো বদনাম শোনা যায় নি।*

* Leonard Merrickএর একটি গল্পের ছায়া অবলম্বনে।